রবীন্দ্রবীক্ষা

রবীন্দ্রচর্চার ষাণ্মাসিক সংকলন

সংখ্যা ৪

সৌজন্য সংখ্যা

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

চতুর্থ সংকলন : পৌষ ১৩৮৪ - শ্রাবণ ১৩৮৫

রবীন্দ্রচর্চাপ্রকল্প ও রবীন্দ্রভবন কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদক : শ্রীকানাই সামন্ত

সহকারী সম্পাদক : শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক

মুদ্রক শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য

তাপসী প্রেস। ৩০ বিধান সরণি। কলিকাতা-৭০০০০৬

রবীন্দ্রভবন ও রবীন্দ্রচর্চা-প্রকল্পের যৌথ প্রযত্নে ষাণ্মাসিক সংকলন-রূপে রবীন্দ্রবীক্ষার প্রচার।

মুখ্যতঃ রবীন্দ্র-জীবন, রবীন্দ্র-রচনা ও রবীন্দ্র-রচনার পাঠবৈচিত্র্য তথা পাঠ-অভিব্যক্তি এ-সবের বস্তুনিষ্ঠ ও প্রণালীবদ্ধ সমাহার এবং আলোচনাই এর অভীষ্ট। এজন্য এই পত্রিকায় প্রকাশিত হতে পারবে—

১. রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত বাংলা ইংরেজি চিঠিপত্র ও অন্যান্য রচনা।

২. রবীন্দ্রনাথকে লেখা বিশিষ্ট চিঠিপত্র ও রচনা।

৩. শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত যাবতীয় রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির বা রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত পাণ্ডুলিপির অপ্রচারিত বা বিরলপ্রচারিত সূচী, বিবরণ ও পাঠ।

৪ রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহের অন্যান্য বস্তুর তালিকা ও বিবরণ। যেমন :

ক. রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রাবলি।

খ রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি ও রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক চিত্রাবলি।

৫. দেশে বিদেশে নানা প্রতিষ্ঠানের তথা ব্যক্তির সংগ্রহে যে-সব রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি বা রবীন্দ্রপ্রাসঙ্গিক বিষয় সঞ্চিত, তার তালিকা, বিবরণ ও চিত্র।

৬. রবীন্দ্রনাথের দেশ-বিদেশ-ভ্রমণের বিবরণ।

৭. নানা উপলক্ষে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাপাঠ তথা অলিখিত ভাষণ প্রতিভাষণ— এ-সবের বিবরণ, শ্রুতিলিখন, স্মৃতিলিখন।

৮. রবীন্দ্রনাথ-প্রযোজিত / অভিনীত নাটক নৃত্যনাট্য গীতিনাট্য ঋতুৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠান -সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও নির্ভরযোগ্য সমকালীন বিবরণ।

৯. রবীন্দ্র- পরিবার বান্ধবগোষ্ঠী ও যুগ এ-সবের পরিচায়ক যা-কিছু নিদর্শন তার বস্তুনিষ্ঠ বিচার বিবরণ ও তালিকা।

১০. রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত গ্রন্থের ও রচনার সূচী।

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে এই সাময়িক সংকলনের প্রবর্তন। এ কাজে প্রতিষ্ঠানের আর প্রতিষ্ঠানের বাইরে দেশ-বিদেশের সকল রবীন্দ্রানুরাগী সুধীজনের দৃষ্টি সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়। যেখান থেকে যে-কেউ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে, তাঁর জীবন ও তাঁর কাজ সম্পর্কে, যে-কোনো নূতন তথ্য বা উপকরণ সংগ্রহ করে সেই বস্তু বা / এবং তার চিত্র তার বিবরণ পাঠালে তা সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হবে— সময় সুযোগ ও প্রয়োজন -মত ব্যবহারও করা চলবে।

শ্রীসুরজিৎচন্দ্র সিংহ

১ অগস্ট, ১৯৭৬ উপাচার্য : বিশ্বভারতী

সূচীপত্র

নানা অনিবার্য কারণে রবীন্দ্রবীক্ষা প্রকাশে অনেক বিলম্ব হইল, সে ত্রুটি মার্জনীয়।

রচনা : মার্চ্ ১৯৩৮। ফাল্গুন ১৩৪৪

চিত্রলিপি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছবির জগতে যেথা কোনো ভাষা নেই
সেথায় তোমার স্থির দৃষ্টি
যে কাহিনী করিতেছে সৃষ্টি
ঘটনাবিহীন তার বোবা ইতিহাস
ছায়া দিয়ে ছেয়ে ফেলে চিত্ত আকাশ,
করুন বিষাদ করে বৃষ্টি॥

২

শৈশবে চাঁদের কোলে অলক্ষ্যে ছুটিত মায়ারথ
যেথা মরীচিকা পুরে গুপ্ত ছিল অদেখা পর্বত।
হারায়েছি সহজ সে পথ।
আজি এ তুলির মুখে আনি
অভিনব ভূগোলের সৃষ্টির মায়াবী মন্ত্রখানি॥

৩

দিনান্তে ধরণী যথা চেয়ে থাকে স্তব্ধ অনিমিখে
নিশীথের সপ্তর্ষির দিকে—
জীবনের প্রান্ত হতে তেমনি কি শান্ত তব চোখ
দেখিতেছে সুদূর আলোক॥

৪

হে বিজ্ঞানী দেখিছ কি রহস্যের দুর্গদ্বার ভেদি
দুর্গম মন্দির মাঝে সত্যের গোপনতম বেদী।
সন্ধানের সুকঠিন আনন্দেই
আপনারে কিছু মনে নেই॥

৫

বহিয়া হাল্‌কা বোঝা চলে যায় দিন তার,
অবকাশ দেয় না সে কোনো দুশ্চিন্তার।
সম্বল কম বটে, আছে বটে ঋণ-দায়
অনুরাগ নেই তবু ভাগ্যের নিন্দায়।
পাড়াপ্রতিবেশীদের কটুতম ভাষ্যে
নীরব জবাব তার স্মিত ঔদাস্যে।
জন্মমুহূর্তেই পেয়েছিল যৌতুক
ভাঙাচোরা জীবনের বিদ্রূপে কৌতুক॥

৬

যে জগৎ ছিল আঁধারে ডুবিয়া
আলোতে উঠিল ভেসে,
অনাদি কালের তীর্থসলিলে
প্রাতঃস্নানের বেশে॥

৭

বাস্তবের হাট থেকে শুধু নিয়ে এলে দেহরূপ
নামহারা রেখাপথ বেয়ে।
রয়ে আছ চুপ
চক্ষু করে নিচু,
খুঁজিছ, কোথাও যদি আত্মপরিচয় পাও কিছু॥

'চিত্রলিপি'র রূপান্তর

রবীন্দ্রনাথ

কে জানে কার মুখের ছবি কোথার থেকে ভেসে
ঠেকল অনাহূত আমার তুলির ডগায় এসে।
সাইকোএনালিসিস্‌-যোগে ইহার পরিচয়
পণ্ডিতেরা জানেন স্পষ্ট, আমার জানা নয়॥

A strange face, uninvited
hovers before my brush
making me wonder
whence does it appear.

—চিত্রলিপি-১ (১৯৬২), একাদশ চিত্র

২

পথে পথে অরণ্যে পর্বতে
চলিতে চলিতে হয় দেখা,
বিস্মৃতির পটভূমিকায়
স্মৃতি কিছু রেখে যায় রেখা॥

Memory leaves its touches
on the screen of oblivion
as the mind lingers
on its wayside wanderings.

—চিত্রলিপি-১, তৃতীয় চিত্র

৩

কাঙবুড়ির দিদিশাশুড়ির
পাঁচ বোন থাকে কাল্‌নায়—

রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত মুখাকৃতি

'বহ্বিয়া হালকা বোঝা'
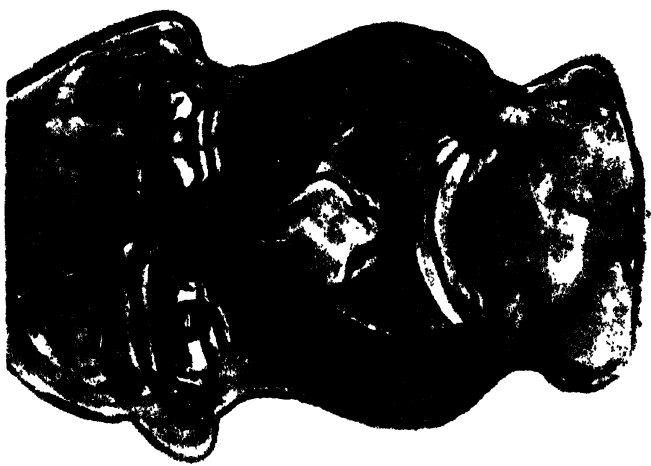
খাপছাড়া-ধৃত 'অতুল খুড়ো'।   শিল্পী রবীন্দ্রনাথ

শাড়িগুলো তারা উনুনে বিছায়,
হাঁড়িগুলো রাখে আল্‌নায়।
কোনো দোষ পাছে ধরে নিন্দুকে
নিজে থাকে তারা লোহা-সিন্দুকে,
টাকাকড়িগুলো হাওয়া খাবে ব'লে
রেখে দেয় খোলা জাল্‌নায়—
নুন দিয়ে তারা ছাঁচিপান সাজে,
চুন দেয় তারা ডাল্‌নায়॥

—খাপছাড়া, ১

৪

ব্রিজ্‌টার প্ল্যান দিল বড়ো এন্‌জিনিয়ার
ডিস্‌ট্রিক্‌ট্‌ বোর্ডের সব চেয়ে সীনিয়ার।
নতুন রকম প্ল্যান দেখে সবে অজ্ঞান—
বলে, 'এই চাই, এটা চিনি নাই-চিনি আর।'
ব্রিজ্‌খানা গেল শেষে কোন্‌ অঘটন-দেশে,
তার সাথে গেছে ভেসে ন হাজার গিনি আর॥

—খাপছাড়া, ৩০

৫

মুচকে হাসে অতুল খুড়ো,
কানে কলম গোঁজা।
চোখ টিপে সে বললে হঠাৎ,
'পরতে হবে মোজা।'
হাসল ভজা, হাসল নবাই,
'ভারী মজা' ভাবল সবাই,
বয়-সুদ্ধ উঠল হেসে—
কারণ যায় না বোঝা।

—খাপছাড়া, ১৪

বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৮০ বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যার সূচনায় ছাপা হয় 'চিত্রলিপি', অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের নিজের আঁকা ষোলোখানি ছবির ষোলোটি কবিতা-ভাষ্য। কবিতাগুলি অপ্রকাশিত বা অপ্রত্যাশিত হইলেও ছবি তেমন নয়, পূর্বেই ছাপা হইয়াছিল Visva-Bharati Quarterly'র তিন বৎসরের কয়েকটি সংখ্যায় (মে ১৯৩৬ - ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮) এবং অনেকগুলি পরে রবীন্দ্রনাথের 'সে' ও 'খাপছাড়া'য়— আরও পরে প্রথম-খণ্ড চিত্রলিপি'তে (প্রকাশ : ১৯৪০ সেপ্টেম্বর। সংস্করণ : ১৯৬২)। ত্রৈমাসিক বিশ্বভারতী (ইংরেজি) ছাড়া সমুদয় ছবি 'সে' 'খাপছাড়া বা 'চিত্রলিপি' কোনো একটি গ্রন্থে নাই— ছাপা হইয়াছে প্রচল 'সে' গ্রন্থে পাঁচটি, 'খাপছাড়া'য় চারটি, প্রথম-খণ্ড 'চিত্রলিপি'র প্রথম-প্রকাশকালে তিনটি আর উহারই দ্বিতীয় সংস্করণে আরও একটি। অপিচ দ্বিতীয় খণ্ড চিত্রলিপির (ডিসেম্বর ১৯৫১) সুপরিচিত শেষ ছবিটি, যাহার অনন্য কবিতা-ভাষ্য বিশ্বভারতী পত্রিকার উক্ত সংখ্যায় প্রথম কবিতাতেই : যাহা-খুশি তাই করে বিশ্বশিল্পী সকালে বিকালে ইত্যাদি। বিশ্বভারতী পত্রিকায় ষষ্ঠ কবিতার লক্ষস্থল যে নারীমুখচ্ছবি সেটি পত্রিকার ঐ সংখ্যাতেই '২৭৪-৭৫' পৃষ্ঠার অন্তর্নিবিষ্ট। বাকি একটি ছবি কেবল V. B. Quarterlyতেই দ্রষ্টব্য, ১৯৩৮ ফেব্রুয়ারির মুখপাত-হিসাবে। এ ছবি সম্পর্কে 'কোয়ার্টারলি'র সম্পাদক বলেন, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ তারিখে দীর্ঘ মোহাচ্ছন্ন অবস্থা হইতে সংজ্ঞালাভ করিবার পর কবি রোগশয্যার পাশে রাখা এক টেবিলের ভেনেস্তা টপ-এর উপরে এই ছবি আঁকেন। উক্ত বিশ্বভারতী পত্রিকার চতুর্দশ তথা বর্তমান রবীন্দ্রবীক্ষার ষষ্ঠ কবিতায় (লেখাঙ্কনচিত্রে) কবি ঐ ছবিরই ভাষ্য রচনা করেন।

সম্প্রতি বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহের এক পৃথক পাণ্ডুলিপিগুচ্ছে (সংখ্যা ২৯৬) দেখা যাইতেছে, ইতঃপূর্বে বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ ষোলোটি কবিতাই রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চ বিশেষ যত্নে স্বহস্তে নকল করেন যাহাতে পরিষ্কার 'লাইন ব্লক' হয় ও সংকল্পিত চিত্র-লিপি গ্রন্থে সুষ্ঠুভাবে ছাপা যায়। কিন্তু নিজের কবিতা নিজে নকল করিতে গিয়া বহু স্থলেই কবি যে নূতন পাঠ উদ্ভাবন করিবেন, ইহাতেও বিস্ময়ের কোনো কারণ নাই। ফলে যে যে কবিতায় কম-বেশি কোনো পাঠভেদ ঘটিয়াছে কেবল সেই সাতটির লিপিচিত্র রবীন্দ্রবীক্ষার বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করা গেল। সেই উপলক্ষ্যে অন্তত পাঁচটি ছবির যে পৃথক কবিতা-ভাষ্য অন্যত্র মুদ্রিত প্রচারিত বা পরিচিত, সেগুলিও সংকলন করা হইল। পূর্বোক্ত বিশ্বভারতী পত্রিকায় (১৩৮০ বৈশাখ-আষাঢ়। পৃ ২৭৬) সম্পাদকীয় মন্তব্যের শেষ অনুচ্ছেদে বড়ো মিথ্যা বলা হয় নাই যে, সে-খাপছাড়া'র তুলনায় বর্তমান কবিতাগুচ্ছে কবিদৃষ্টির অপূর্ব বৈশিষ্ট্য এই দেখা যায় যে, সে দৃষ্টি প্রায়শই প্রীতিস্নিগ্ধ আর সমুপস্থিত বিষয়ের গভীরেও প্রবেশ করে, তাহাতে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বা পরিহাসের কোনো আভাস নাই।

রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপির চিত্রে পর পর সংখ্যা আরোপ করিলে বলা যায়, এই গুচ্ছের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ বিশ্বভারতী পত্রিকায় (১৩৮০ বৈশাখ-আষাঢ়। পৃ. ২৭১-৭৫) যথাক্রমে— ২, ৪, ৮, ৯, ১০, ১৪ ও ১৫।

তাসের দেশ*

রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি ৯এ

২ আমার হৃদয় আজি যায় যে ভেসে—
যার পায় নি দেখা তার উদ্দেশে।
বাঁধন ভোলে হাওয়ায় দোলে
যায় সে বাদল মেঘের কোলে রে
কোন্ সে অসম্ভবের দেশে।
সেথায় বিজন সাগরকূলে
শ্রাবণ ঘনায় শৈলমূলে।
রাজার পুরে তমাল গাছে
নূপুর শুনে ময়ুর নাচে রে
সুদূর তেপান্তরের শেষে॥

৩ রাজকুমারের মন অস্থির। রাজপুরীতে সে যেন লক্ষ্মীর খাঁচায় পোষা পাখী। জানলা থেকে দেখা যায় ঢেউ উঠ্‌চে সমুদ্রে, অচল তটকে জাগিয়ে তুলতে চায় বারবার আঘাত করে। সমুদ্র তার ফেনিল ইঙ্গিতে মন টানচে সুদূরের দিকে—
রাজপুত্র গাইছে—

আমি চঞ্চল হে—

—n—

ডাক্‌ল ও বন্ধু, ও সদাগরের পুত্র। সদাগরের পুত্র এসে বললে—কী মিতা, কী চাই।

---

* যে রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির আনুপূর্বিক গ্রাহ্য পাঠ সংকলিত, তাহাতে এই শিরোনাম নাই। মলাট বাদে, রবীন্দ্রনাথের লেখার শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত লেখা ও না-লেখা, তাসের দেশ-সম্পর্কিত ও নিঃসম্পর্কিত পৃষ্ঠাগুলির পর পর গণনা। তদনুযায়ী প্রত্যেক পৃষ্ঠার সূচনায় বর্তমান সংকলনের বাম দিকে যথোচিত ক্রমিক অঙ্কের আরোপণ। প্রথম পৃষ্ঠায় গ্রাহ্য পাঠ নাই (যাহা আছে তাহা বর্জনচিহ্নিত)। আর, চতুর্থ বা ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় কোনো লেখা নাই, অন্য কোনো কোনো জোড়পৃষ্ঠায় নাটকের অঙ্গীভূত নয় এমন লেখা থাকিতে পারে—এরূপ সমুদয় পৃষ্ঠাঙ্ক-সংকেতই বর্তমান সংকলনে কোনো কাজে আসে নাই অথবা ব্যবহার করা হয় নাই। কেবল একাদশ পৃষ্ঠায় বর্জিত পাঠ সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া গেল।

৫ রাজপুত্র বল্‌লে চলো এবার সওদা করতে। সওদাগরের পুত্র বলে কিসের সওদা। পুরোনো জীবন বদল করে নতুন জীবন— বলে রাজপুত্র হাসলে। সওদাগরের পুত্র বললে এমন সওদার কথা শুনি নি— সন্ধান পাব কোথায়?

রাজপুত্র বললে বেড়া ডিঙোলেই পাওয়া যাবে। বাঁধা পথ পেরোবার সাহস যার আছে তারই জন্যে বসে আছে নবীনা, কোলে নিয়ে বরমাল্য। আর দেরি কেন— দিনে দিনে দৃষ্টিতে পড়চে আবরণ।

৭ হে নবীনা,

প্রতিদিনের পথের ধূলায়

যায় না চিনা।

শুনি বাণী ভাসে

বসন্ত বাতাসে,

প্রথম জাগরণে দেখি সোনার মেঘে লীনা ॥

হে নবীনা

স্বপনে দাও ধরা

কী কৌতুকে ভরা,।

কোন অলকার ফুলে

মালা সাজাও চুলে,

কোন্‌ অজানা সুরে

বিজনে বাজাও বীণা।

হে নবীনা।

রাজমাতা এসে জিজ্ঞাসা করেন বাছা তোমার মন উতলা দেখি যে।

৯ রাজপুত্র বলে— মা, কেমন করে বুঝিয়ে বলব যার কোনো অর্থ নেই। হঠাৎ মন উঠ্‌ল পাখীর মতো পাখা ঝাপটিয়ে, কী বলি কী বলি করতে লাগল প্রাণ —তখন ভূর্জ্জপত্রে লিখলেম গান, মধুরিকাকে দিলেম শিখিয়ে, বল্‌লেম আমার অশান্ত মনের ছন্দে তুমি নাচো— সে নাচল। মধুরিকা তুমি আমার বাণীর বাহন— আমার কথাটা মাকে জানিয়ে দাও—

মধুরিকা গান ধরলে, নাচতে লাগল—

১০ পাখী আমার নীড়ের পাখী

১১ ×প্রথম আলোর চরণধ্বনি··· জ্যোতিঃ সমুদ্রেই ॥×

১৩ মা বল্‌লে বাছা, তোমার কোনো অভাব নেই তাই তোমার মন ব্যাকুল হয়েছে— বুঝেচি তুমি চাইতে চাও।

তোমার মন বলে চাই চাই
চাই গো,
যারে নাহি পাই গো।
সকল পাওয়ার মাঝে
তোমার মনে বেদন বাজে
নাই নাই
নাই গো।

রাজপুত্র

হারিয়ে যেতে হবে
আমায় ফিরিয়ে পাব তবে।
সন্ধ্যাতারা যায় যে চলে
ভোরের তারায় জাগবে বলে—
বলে সে যাই যাই
যাই গো॥

১৫ মা বল্‌লেন, বাছা তুমি কোথায় যাবে বলো। তোমাকে ধরে রাখতে গেলেই তোমাকে হারাব। তুমি বইতে পারবেনা সুখের বোঝা, সইতে পারবে না স্নেহ-সেবার বাঁধন। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে বলব তুমি যাও ভরা মনে আমার ঘরে ফিরে আসবার জন্যেই। তুমি আকাশে যাবে পাখা মেলে, নীড়ে ফেরবার রাস্তাই তো সেই। কিন্তু তুমি তো কখনো ঘরের বার হও নি তোমাকে পথ দেখাবে কে?

রাজপুত্র বললে, চিরকাল যারা পথের পথিক তারা হবে আমার সঙ্গী —হা ও য়া আ স বে ছু টে আ প নি লা গ বে আ মা র পা লে, ১৭ জোয়ার আসবে নদীতে, অকূল থেকে, আপনি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে আমার তরী। ওরা সব চলে যাওয়ার দল প্রভাতের তারা শরতের মেঘ, গোধূলির আলো— ওরা ডাক দিয়েচে, ওরা পথ দেখাবে। ধরো সেই পাগল করার

গান মঞ্জরিরী—

কেন আমায় পাগল করে যাস

ওরে চলে যাওয়ার দল

আকাশে বয় বাতাস উদাস

পরাণ টলমল।

প্রভাত তারা দিশাহারা

শরৎ মেঘের ক্ষণিক ধারা

উধাও পথের একতারাতে

তান দিল চঞ্চল॥

১৯ শিউলি বনের শাখা আকুল

পথিক হাওয়ার মিতা,

গোধূলি গায় আঁধার পথে

রক্ত আলোর গীতা।

কাশ মাতে তার মঞ্জরীতে

শরৎ প্রাতের উতোর দিতে,—

রাতের তরীর পাল ওড়ালো

সাঁঝের দিগঞ্চল—

—•—

রানী বল্‌লেন, আমি ভয় করে অকল্যাণ করব না। বর্ষা যাবার মুখে। এসেচে তোমার অভিযানের সময়।— ললাটে লও মায়ের হাতে শ্বেত চন্দনের তিলক— শ্বেত উষ্ণীষে পরো শ্বেত করবীর গুচ্ছ।— ও মণি-মালিকা তোদের সেই জয়যাত্রার গানটা ধর্‌।

২১ জয়যাত্রায় যাও গো—

ওঠো জয়রথে তব।

মোরা জয়মালা গেঁথে

আশা চেয়ে বসে রব।

আঁচল বিছায়ে রাখি

পথধুলা দিব ঢাকি,

ফিরে এলে হে বিজয়ী

হৃদয়ে বসিয়া লব।

এনে দিয়ো তব হাসি

মোদের সজল চোখে—

এনো মিলনের সুধা

মোদের বিরহ শোকে।

আঁধার ঘরেতে আলো

নতুন শিখায় জ্বালো,

পরাও রাতের ভালে

চাঁদের তিলক নব॥

২৩ মা বল্‌লেন, আমি কুলদেবতার পূজা সাজাতে যাই— আজ সন্ধ্যার সময় আরতি প্রদীপের কাজল চোখে নিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে যেয়ো।

প্রস্থান—

রাজপুত্র বললে,— এবার ধর যাত্রার গানটা—

হের সাগর ওঠে তরঙ্গিয়া

বাতাস বহে বেগে।

সূর্য্য যেথায় অস্তে নামে

ঝিলিক মারে মেঘে।

দক্ষিণে চাই উত্তরে চাই

ফেনায় ফেনা, আর কিছু নাই

যদি কোথাও কূল নাহি পাই

তল পাব তো তবু।

ভিটার কোণে হতাশ মনে

রৈব না আর কভু॥

অকূল মাঝে ভাসিয়ে তরী

যাচ্চি অজানায়।

২৫ আমি শুধু একলা নেয়ে

আমার শূন্য নায়।

নব নব পবনভরে
যাব দ্বীপে দ্বীপান্তরে,
নেব তরী পূর্ণ করে
অপূর্ব্ব ধন যত।
ভিখারী মন ফিরবে যখন
ফিরবে রাজার মতো॥

—n—

২৬ আমি ফিরব না আর ফিরব না আর
ফিরবনারে।
ঝোড়ো হাওয়ায় ভাসল তরী
হয় তো কূলে ভিড়ব না ভিড়ব না রে।
পালের রসি গেছে কেটে
যাক্‌না ছিঁড়ে যাকনা ফেটে—
পারের ভরসা যদি যায় উড়ে যায়
ভয়ে বুকের নাড়ি ছিঁড়বনা ছিঁড়বনারে

২৭ ২

ঝড় এল সমুদ্রে। তীরের কাছে এসে ডুবল তরী। রাজপুত্র সদাগরের পুত্র উঠ্‌লেন তাসের দ্বীপে। দূরে দেখা যায় যেন বেগ্‌নি কুয়াশার রঙে ছবি-আঁকা বন। সমুদ্রের নীলিমা পশ্চিম দিগন্ত পর্য্যন্ত— পূর্ব্বদিকে বালুতটে হলদের আভা দেওয়া পাণ্ডুবর্ণ। উঁচু পাড়ির উপরে দেখা যাচ্ছে চারকোণা সব ঘর, লাল কালো রঙে আঁকা। রাজপুত্র আনন্দে গান ধরেছে— সদাগরের পুত্র যোগ দিয়েচে সঙ্গে।

এলেম নতুন দেশে
তলায় গেল ভগ্ন তরী
কূলে এলেম ভেসে।
অচিন মনের ভাষা
শোনাবে
অপূর্ব্ব কোন্ আশা,

২৯ বোনাবে

রঙীন সুতোয় দুঃখ সুখের জাল,
বাজবে প্রাণে নতুন গানের তাল,
নতুন বেদনায় ফিরব কেঁদে হেসে ॥
নাম-না-জানা প্রিয়া
নাম-না-জানা ফুলের মালা নিয়া
হিয়ায় দেবে হিয়া।
যৌবনেরি নবোচ্ছ্বাসে
ফাগুন মাসে
বাজবে নূপুর বনের ঘাসে,
মাতবে দখিন বায়
মঞ্জরিত লবঙ্গলতায়—
চঞ্চলিত এলোকেশে ॥

এমন সময়ে এলো তাসের দলের কয়েকজন। রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করলেন কে হে তোমরা? তারা উত্তর করলে আমরা শ্রীযুক্ত ছক্কা পঞ্জা ছুরি তিরি। রাজপুত্র শুধোলেন, উপাধি কী? তারা বল্‌লে উপাধি কাকে বলে? গ্রাবু, না

৩১ বিন্‌তি, না পোকার্ না ব্রিজ্।

সদাগরের পুত্র বল্‌লে— না না, যেমন ছক্কা শর্ম্মণ, পঞ্জা বর্ম্মণ, তিরি ঘোষ, ছুরি দাস।

তারা বল্‌লে না আমরা সরল— আমাদের যে নাম সেই নাম একটু এদিক ওদিক নেই।

রাজপুত্র শুধোলেন আজ এখানে তোমাদের জনতা দেখচি কেন?

ছক্কা বুক ফুলিয়ে বল্‌লে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল এই মাত্র— রাঙাদের দলের হয়েচে জিৎ।

কেমনতরো যুদ্ধ হে তোমাদের? তোমরা কোন জাতের মানুষ বুঝিয়ে বলো তো।

ওরা গান ধরলে—

আমরা চিত্র— অতি বিচিত্র।
অতি বিশুদ্ধ অতি পবিত্র।

রাজপুত্র বললেন, তা হোতে পারে কিন্তু তোমাদের বড়ো যে ঠাণ্ডা দেখাচ্চে।
৩৩ যুদ্ধে একটা রাগারাগি হয় তো।
পঞ্জা বল্লে— রাগ! রাগ আমাদের রঙে।

আমাদের যুদ্ধ
নহে কেহ ক্রুদ্ধ,—
ঐ দেখ গোলাম
অতিশয় মোলাম—

সদাগর বললে— সে তো বুঝচি— কিন্তু কামান বন্দুকটা অন্তত দেখতে শোভা পায়।
তিরি জবাব করলে—

নাহি কোনো অস্ত্র
খাকি রঙা বস্ত্র—

রাজপুত্র বল্‌লেন— একটা নালিশ নিয়ে দুই পক্ষ তো খাড়া হয়।
ছুরি বল্‌লে—

বাঁধা রীতি জানি
সেই মতে মানি—
কে তোমার শত্রু কে তোমার মিত্র।

৩৫ তখন সকলে মিলে সমস্ত গানটা ধরলে—

আমরা চিত্র, অতি বিচিত্র
অতি বিশুদ্ধ, অতি পবিত্র।
আমাদের যুদ্ধ
নহে কেহ ক্রুদ্ধ,
ঐ দেখ গোলাম
অতিশয় মোলাম,—
নাহি কোনো অস্ত্র,
খাকি-রঙা বস্ত্র,
বাঁধা রীতি জানি
সেই মতে মানি,
কে তোমার শত্রু, কে তোমার মিত্র॥

রাজপুত্র বল্‌লেন, এবার আমরা যে চিত্র নই তার একটুখানি পরিচয় দিই এদের কাছে।—

আমরা নূতন যৌবনেরি দূত।
আমরা চঞ্চল আমরা অদ্ভুত।
আমরা বেড়া ভাঙি—
আমরা অশোক বনের নেশায় রাঙি
ঝঞ্ঝার বন্ধন ছিন্ন করে দিই আমরা বিদ্যুৎ।

৩৭ আমরা করি ভুল,
অগাধ জলে ঝাঁপ দিয়ে যুঝিয়া পাই কূল।
যেখানে ডাক পড়ে
জীবন মরণ ঝড়ে
আমরা প্রস্তুত॥
আমরা চঞ্চল আমরা অদ্ভুত।

তাসের দল মুখ চাওয়া চাওয়ি করে বল্‌লে এ চল্‌বে না, চল্‌বে না।

রাজপুত্র বল্‌লে, যা চলবে না তাকেই তো আমরা চালাই সেই জন্যেই এসেছি সমুদ্রপারে।—

না চলবে না।

রাজপুত্র হেসে বল্‌লেন— কী হলে চল্‌বে শুনি।

চলো নিয়ম মতে—
দূরে তাকিয়ো নাকো
ঘাড় বাঁকিয়ো নাকো
চলো সমান পথে
চলো নিয়মমতে।
হেরো অরণ্য ওই
হোথা শৃঙ্খলা কই—
পাগল ঝরনাগুলো দক্ষিণ পর্ব্বতে।
ওদিক চেয়োনা যেয়োনা যেয়োনা
চলো সমান পথে॥

৩৭।১ রাজপুত্র বল্‌লেন, জীবনে অসাধ্য সাধন করেছি বিস্তর— কিন্তু তোমাদের

যা উপদেশ এটার মতো কঠিন কিছুই জানিনে।— ছক্কা বললে বিদেশী, ভয় নেই এখানকার সাধনা কিছুদিন চলুক দু দিন গেলেই আমাদের সঙ্গে একেবারে রং মিলে যাবে, চেনা যাবে না। সবাই মিলে গম্ভীর গলায় বললে তোমরা ভালোমানুষ ঠিক আমাদের মতো। ঐ রাজাসাহেব আসচেন, রানী বিবি আসচেন, আমাদের সভা এইখানে বসবে। অনেক শিক্ষা হবে তোমার। রাজা রানী গোলাম প্রভৃতি রাজ অমাত্যবর্গ প্রবেশ করলে।

৩৮ সবাই ছবির মতো দাঁড়ালো
নড়াচড়া নেই।

৩৯।২ সকলে গান ধরলে—

মোরা চলব না
মুকুল ঝরে ঝরুক মোরা ফলব না।
৪১ সূর্য্যতারা আগুন ভুগে
জ্বলে মরুক যুগে যুগে
আমরা যতই পাই না জ্বালা
জ্বলবো না।
বনের শাখা কথা বলে
কথা জাগে সাগর জলে,
এই ভুবনে আমরা কিছুই
বলব না।
কোথা হতে লাগে রে টান
জীবনজলে ডাকে রে বান,
আমরা তো এই প্রাণের টলায়
টলব না॥

ছক্কা এসে বললে, রাজা সাহেব এরা বিদেশী।
রাজা বললে, "বিদেশী। সে যে বড়ো উৎপাত। কিছুর সঙ্গে মিলবে না।"
রাজপুত্র হেসে বললেন "তোমাদের এখানে আর সবই আছে কেবল নেই উৎপাত— আমরা বিদেশ থেকে তরী বোঝাই করে এনেছি উৎপাত।"
৪৩ রাজপুত্র হরতনের টেক্কার সামনে দাঁড়িয়ে গাইলে—

| | |

ওগো শান্ত পাষাণ মূরতি

সুন্দরী—

চঞ্চলেরে হৃদয়তলে লও বরি।

কুঞ্জবনে এসো একা

নয়নে অশ্রু দিক দেখা—

অরুণ রাগে হোক রঞ্জিত

বিকশিত বেদনার মঞ্জরী।

রাজা সাহেব বল্‌লে, বিদেশী তুমি নিয়ম রক্ষা করচ না।—

না আমি নিয়ম ভঙ্গ করচি।

সকলে মিলে বলে উঠ্‌ল, কেন, কেন, কেন এই স্পর্দ্ধা।

রাজপুত্র বল্‌লে, ইচ্ছে।

ইচ্ছে। সে আবার কী।

রাজপুত্র গাইল

ইচ্ছে।

সেই তো ভাঙচে সেই তো গড়চে

সেই তো দিচ্ছে নিচ্ছে।

৪৫ সেই তো আঘাত করচে তালায়

সেই তো বাঁধন ছিঁড়ে পালায়

বাঁধন নিতে সেই তো আবার ফিরচে।

হরতনের টেক্কার সামনে গিয়ে, সুন্দরী, ইচ্ছের বসন্ত হাওয়া এখনি তোমার মনের মধ্যে পৌঁছল—তোমার চোখের পল্লব উঠ্‌ল কেঁপে। বাধা দিয়ো না বাধা দিয়ো না।

রাজা সাহেব হরতনের টেক্কাকে বললে—তুমি যাও, এই বিদেশী জানে না, কী করে ব্যবহার করতে হয়। ও বর্ব্বর আমাদের দেশের নিয়ম শেখে নি।

ওকি ও, হরতনী কানে পৌঁছল না কথাটা।

চিঁড়েতনী টেক্কা দেখচ তো এর ব্যবহার?

নিয়ম ভুলল এক মুহূর্ত্তে। কেন এমন হোলো।

হরতনের টেক্কা বলে উঠল, ইচ্ছে।

৪৭ সব টেক্কারা এক সঙ্গে ধন্য ধন্য করে উঠল— বললে ইচ্ছার হোক জয়। রাজা সাহেব আসন ছেড়ে উঠে পড়ল। রানা সাহেবের হাত ধরে ব'লে উঠ্‌ল ইচ্ছার হোক জয়।

আয় রে তবে, মাত রে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।
পিছন পানের বাধন হোতে
চল্‌ ছুটে আজ বন্যাস্রোতে
আপনাকে আজ দখিন হাওয়ায়
ছড়িয়ে দে রে দিগন্তে।
বাঁধন যত ছিন্ন করো আনন্দে—
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।
অকূল প্রাণের সাগরতীরে
ভয় কী রে তোর ক্ষয় ক্ষতিরে,
যা আছে রে সব নিয়ে তোর
ঝাঁপ দিয়ে পড় অনন্তে॥

পত্রালাপ : রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র

বাংলা ১৩১৯ সনে রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহার সূচনাতেই আছে 'বন্ধুবর' শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা ৮ খানি চিঠি। 'ছিন্নপত্র', অতএব পুরা চিঠি কোনোটি নয়। স্থানে স্থানে পাঠ বদল করা হয় এরূপও দেখা যায়। ছিন্নপত্রে লওয়া যায় নাই, শ্রীশচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এমন অনেক চিঠি উত্তরকালে বিশ্বভারতী পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৪৯, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৮, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৩ ও বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪ সংখ্যায় আর তদতিরিক্ত একখানি চিঠি অপর এক সাময়িক পত্রে (অতএব/প্রথম বর্ষের ১৩৭১ আষাঢ়, পৃ ১৩) প্রচারিত হইয়াছে। শেষোক্ত চিঠি ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আর সব চিঠিরই মূল পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত। তদতিরিক্ত রবীন্দ্রনাথের অপর এক-খানি চিঠি (চৈত্র ১৩০৯) এবং শ্রীশচন্দ্রের দুইখানি চিঠি (তারিখ ৭ জুলাই ১৮৯৮ ও ২২ নভেম্বর ১৯০০), এগুলির মূল পাণ্ডুলিপিও রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত। এই চিঠিগুলির বা 'অতএব' পত্রে মুদ্রিত চিঠির বিশেষ প্রচার হয় নাই বলা যায়— এজন্য রবীন্দ্রবীক্ষার বর্তমান সংখ্যায় কালক্রমে পর পর সংকলন করা যাইতেছে। অতঃপর ছিন্নপত্র গ্রন্থে মূল চিঠির যে যে অংশ বর্জিত বা যে-সকল পাঠভেদ ঘটিয়াছে (কদাচিৎ মুদ্রণপ্রমাদ) তাহাও সংকলন করার উপযোগিতা আছে।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের চিঠি

ওঁ

মেদিনীপুর
৭ই জুলাই। ৯৮

ভ্রাতঃ

শুনচি তুমি মফঃস্বল অঞ্চল থেকে প্রত্যাবর্ত্তন করে পুনরায় কলিকাতায় বাসা বেঁধেচো। কই, তোমার যে শিলাইদহে দীর্ঘকাল বসবাসের কথা ছিল তার কি হলো ?

কিছুদিন হলো আমি বালেশ্বর এবং তাহার দেহাৎ ঘুরে "গৃহে" ফিরে এসেছি। এবারকার প্রবাসের কষ্টের কথা তোমায় কি বলব ? অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ঘরে বসে দেখতে যেমন সুখকর, পথে বাহির হয়ে মাথায় ধরতে নিশ্চয়ই তেমন নয়। তার উপর রাস্তার কদর্য্যতার জন্য গোযানও দুষ্প্রাপ্য। ১৭ই জুন রাজঘাটের ডাকবাঙলোয় বসে কাজকর্ম করচি, হঠাৎ ৪টার সময় সুবর্ণরেখায় ভয়ানক বন্যা এসে পড়ল। দেখতে দেখতে বিস্তীর্ণ নদীবক্ষ পূর্ণ হয়ে উঠল এবং পরদিন প্রাতে উঠে দেখি বাঙলোর প্রাঙ্গণে স্রোত চলচে। এই অবস্থায় তিনটে চারটে অতি দীর্ঘ এবং উদ্বেগপূর্ণ দিন সেখানে কাটাতে হয়েছিল। বন্যার জন্য

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক্ রোড স্থানে স্থানে ভগ্ন হওয়ায় প [থ] দুর্গম হয়ে উঠেচে। মেদিনীপুরের নীচে কাঁসাই নদীর বান আরও ভয়ানক। বিস্তর জীবজন্তু আর মনুষ্য স্রোতে ভেসে গেছে, পথ ঘাট অনেক স্থলে চুরমার। ১৪ দিনের পর অতিকষ্টে সদরে ফিরে দেখি অনেকগুলি গুরুতর সরকারী "কাজ" আমার অপেক্ষা করে বসে আছে। তাদের বিদেয় করে সম্প্রতি একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচচি।

এখানকার ডিষ্ট্রিক্ট জজ্ কক্স সাহেবের সঙ্গে ঝগড়ার কথা তোমায় সবিশেষ বলে এসেছি। গভর্মেণ্ট কক্সকে খুসী করবার জন্যে আমার কোন কৈফিয়ৎ গ্রহণ না করেই তাঁকে চিঠি লেখার জন্য বলেচেন কাজটা আমার ভাল হয় নাই। তিরস্কারের ভাষাটা প্রবীণ ডেপুটীদের মতে মামুলি রকমের, কিন্তু আমার পক্ষে নূতন এবং ইংরেজীতে যাকে বলে adding insult to injury তাহাই। সেজন্য আমি বিজ্ঞ হিসাবী ডেপুটীবাবুদের মাথার দিব্য দেওয়া পরামর্শ উপেক্ষা করে সম্প্রতি এক "আবেদন" গভর্মেণ্টে পাঠিয়েচি। ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তাতে উল্লেখ করা গেছে। দেখি, এবার চাকরী থাকে কিনা। তের বছরের চাকরী, মায়া হয় বটে, বিশেষতঃ সংস্থান কিছু করতে পারিনি, কিন্তু অন্যায় তিরস্কার বিনা প্রতিবাদে সহ্য করতে যে বিজ্ঞতার প্রয়োজন, এখনও তা আমাতে বিকসিত হয় নি। তোমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের কারবারে যদি স্থান থাকে, আমার জন্যে একটু রাখ্তে চেষ্টা করো। ভরসা করি তোমরা থাকৃতে আমি অনাহারে মারা যাব না।

আমার সাহিত্যচর্চ্চা প্রায় দেড় বছর একেবারে বন্ধ, এজন্য চেষ্টা করেও কিছু লিখে উঠ্তে পারি নি। "সাধনা"য় প্রকাশিত সেই পৌষপার্ব্বণকে ভিত্তি করে একটা উপন্যাস লিখব কয়দিন মনে করচি।

ভরসা করি তোমরা সকলে ভাল আছ এবং বেলু মা জননীর পায়ের ব্যথাটা ভাল হয়েচে। আমাদের একরূপ কুশল। ইতি বৃহস্পতিবার

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

ওঁ

ডালটনগঞ্জ পোঃ অঃ

জেলা পালামৌ

২২।১১।১৯০০

ভ্রাতঃ

তুমি পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছিলে তার পর শিলাইদহে গিয়া আবার রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়াছ, শৈলেশচন্দ্রের পত্রে তাহা জানিয়াছি। পশ্চিমে কোথায় কতদিন ছিলে তাহা জানিতে পারি নাই। এখন বোধ করি বরাবর কলিকাতাতেই অবস্থিতি।

আমি সম্প্রতি মাত্র একটু দূর মফঃস্বল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। বারুণ-ডাল্টনগঞ্জ রেলওয়ে যেখানে পালামৌ জেলায় পড়িয়াছে, রোটাস গড় তাহার অনতিদূরে, আমার অধিকারের সূত্রপাত সেই স্থান হইতে। সোণ নদীর অপর পারে রোটাস পর্ব্বত, যে পথ দিয়া পাহাড়ে উঠিয়া রোটাস গড় যাইতে হয় তাহাও দূর নহে। রোটাস পাহাড় দূর হইতে কৃত্রিম তুঙ্গ প্রাচীর বলিয়া ভ্রম হয়, অন্যান্য পাহাড়ের মত আদৌ তেমন অসমতল নহে, বৃক্ষগুল্মের প্রাচুর্য্য আদৌ নাই। আমি আজ পর্য্যন্ত সোণনদীর তীর পর্য্যন্ত পরিক্রমণ করিয়াই ফিরিতেছি, পাহাড়ে একবারও যাইতে পারিলাম না। নীচে কোয়েল ও সোণ নদীর সঙ্গম, পাহাড়ের উপর হইতে শুনিতে পাই বড় সুন্দর দেখায়। তোমার লেখার পরম ভক্ত এখানকার প্রবীণ উকীল ভুবনবাবু অনেকবার রোটাসে উঠিয়াছিলেন, তিনি দেখা হইলেই আমায় বলেন "যদি কিছু লিখিতে চান, একবার দিন কতকের জন্য রোটাসে বাস করে আসুন।" তুমি কি একবার রোটাসে আসিতে পার না? প্রিয়নাথকে একবার যখন তাঁর গৃহকোটর থেকে টেনে বাহির করতে পেরেচো, তাঁকেও সঙ্গে আন্‌তে পারবে বোধ হয়। বড়দিনের সময় এস না একবার, আমায় একবার দেখা দিয়ে যাও। অনেক দিন তোমায় দেখিনি। রেলের দুই পথ, লক্ষ্মীসরাই থেকে গয়ার ভিতর দিয়া বারুণ পর্য্যন্ত, অন্য পথ মোগলসরাই হইতে ডিহিরি বা বারুণ। গয়ায় এখন প্লেগের হাঙ্গামা, মোগল সরাইয়ের পথই প্রশস্ত। ডিহিরি বা বারুণ হইতে রোটাস গড়ের পথ— ২০ মাইলের বেশী নহে— পালকীর, সে ব্যবস্থা আমি করিব। দিন পাঁচ সাতের জন্য আসিতে পার না?

আমার হাতে প্রথম যে ৪৫ মাইলের কাজ ছিল তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসাতে ভরসা করিয়াছিলাম মাঘোৎসবের সময়টা ছুটি লইয়া তোমাদের কাছে কাটাইতে পারিব। কিন্তু সম্প্রতি রাজহরা হইতে ডাল্টনগঞ্জ পর্য্যন্ত আরো দশ মাইল বিস্তৃত হওয়ার বন্দোবস্ত হইতেছে, পাঁচ মাইলের কাজ আরম্ভ হইয়া গেছে, কাজেই বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত আমায় এ প্রদেশে থাকিতে হইবে। তবে ইহার ভিতর মহীসুর বিবাহের সব যদি স্থির হয়, মাসখানেকের ছুটী লইতে পারিব।

এবার মফঃস্বলে তোমার পরম ভক্ত একটী কুলমহিলার সহিত পরিচিত হইয়াছি। ইহার স্বামী রেলওয়েতে কাজ করেন এবং আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম। ইহার সহধর্ম্মিণী রাজশাহীর প্রসিদ্ধ উকীল ৺গোবিন্দচন্দ্র সেনের দৌহিত্রী— সুতরাং একেবারে আমাদের অপরিচিতা নহেন। তিনি বেশ কবিতা লিখিতে পারেন, অনেক লিখিয়াছেন, তার ভিতর তুমি স্বয়ং ভানুসিংহ একটী কবিতার বিষয়। শুনিতে শুনিতে আমার ভারি আহ্লাদ হইয়াছিল। তাঁর কবিতাগুলি তোমায় একবার দেখিয়া দিতে হবে, কোন ওজর আপত্তি শুনিব না।

সম্বাদপত্রে দেখিয়া সুখী হইলাম পূজনীয় জ্যোতিদাদা মহাশয় ইদানীং সংস্কৃত নাটকগুলির অনুবাদে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। বাঙ্গলা সাহিত্যের একটা প্রধান অভাব এতদিনে পূর্ণ হইতে চলিল। জ্যোতিদাদাকে আমার প্রণাম জানাইবে।

শৈলেশ ভায়া পুস্তকের দোকান খুলিতে প্রস্তুত হইয়াছেন দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। অনেক দিন হইতে আমার যে অভিলাষ, দুই বৎসর পূর্ব্বে তাহার ব্যবস্থাও করিয়াছিলাম, তোমায় হয়ত পরামর্শ জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলাম, ঠিক্ মনে নাই। যাহা হউক তোমার মত হইয়াছে ইহাতে আমারও খুব উৎসাহ হইয়াছে।

শাক্ সবজী ও ফুলের বাগান এখন আমার একটা বিশ্রামের সামগ্রী হইয়াছে। তাহা লইয়া এক রকম থাকি ভাল। পড়াশুনা এক রকম হয়, কিন্তু লেখা বন্ধ। তোমার কাছে দিন কতক থাকিতে পারিলে যদি অভ্যাসের "খি" আবার খুঁজিয়া পাই!

আপাততঃ আমাদের একরূপ কুশল। ছোট বধূ ঠাকুরানীকে আমাদের অভিবাদন জানাইবে। তিনি ছেলে পুলে সহ বোধ হয় তোমার সঙ্গে কলিকাতায় এসেছেন। ইতি—বৃহস্পতিবার।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

রবীন্দ্রনাথের চিঠি

ওঁ

হাজারিবাগ

[চৈত্র ১৩০৯]

ভ্রাতঃ

এখানে পদার্পণ করে অবধি ভুগেছি। জ্বর গেছে কিন্তু কাশি ও দুর্ব্বলতা যায় নি। একে একে আমাদের দলের সকলেই শয্যা আশ্রয় করচে— ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার একটা হাওয়া এসেছে। রেণুকা এখনো বিশেষ ভালর দিকে যায় নি। বোধ হয় ঠিক এই সময়ের হাওয়াটা অনুকূল নয়— বোধ হয় [দে]শ থেকে সে যে জ্বর সঙ্গে করে এনেছিল তার উপরে এখানকার ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা যোগ দিয়েছে। এই ধাকাটা সাম্‌লে উঠে তার পরে যদি স্বাস্থ্যের দিকে যায়।

গিরীন্দ্রবাবু আমাদের যত্নে আচ্ছন্ন করে রেখেচেন। তিনি এ পর্য্যন্ত আমাদের কোন অভাব ঘট্‌তে দেন নি— আমরা তাঁরই বাড়িতে আছি। কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়িটা অত্যন্ত বদ্ধ অন্ধকার। এখানে এসে যেন কারামুক্ত হয়েছি।

সন্তোষকে এফ্, এর জন্যে কোথায় দেবে? প্রেসিডেন্সি কলেজেই তাকে দিতে হবে ত। রথীর সম্বন্ধে আমার একটা ভাবনা রয়ে গেছে।

তুমি যদি পার ত বেলাদের ওখানে যেয়ো। সে খুসি হবে। তোমার বন্ধু সুরজ দেও নারাণ সিংকে লিখে দিয়েছি তিনি ইচ্ছা করলেই আমার কলকাতার বাড়ি অনায়াসে ব্যবহার করতে পারবেন। একবার কেবল যাবার সময় যেন শত্যকে টেলিগ্রাফ করে যান।

[বোল]পুর বিদ্যালয়ের জন্য আমার মন উ[দ্বি]গ্ন হয়ে আছে। আমার

অনুপস্থিতিতে [কো]ন কাজ ঠিক শৃঙ্খলামত চলে না সেই আমার এক আক্ষেপের কারণ হয়েছে।

বঙ্গদর্শনের জন্যে কিছু লিখ্‌চ? অসুস্থ শরীরে আমি কেবল গুটি চার কবিতা লিখেছি।

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সন্তোষকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবে।

ওঁ

বোলপুর

ভ্রাতঃ

তোমরা নববর্ষে আমার সাদর অভিবাদন গ্রহণ করিয়ো এবং ছেলেদের আমার আশীর্ব্বাদ জানাইয়ো।

যুদ্ধে জয়ী হইলেই হইল না যুদ্ধে বাঁচিয়া থাকাও চাই তবেই জিত। দেখা যাক শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায়।

ছুটি লইয়া কোথায় যাইবে কি করিবে কিছু ঠিক করিয়াছ? বলা বাহুল্য বোলপুরের মাঠের প্রতি যদি বধূঠাকুরাণীর আসক্তি থাকে তবে এ পক্ষে বেড়া দিয়া ঠেকাইবে না।

মাধুরীর বিবাহের সম্বন্ধের কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। মীরার জন্য দুই একটি পাত্রের সমাগম দেখা যাইতেছে। হয়ত দুই সখীর বিবাহের শঙ্খ এক রাত্রেই বাজিয়া উঠে। তোমার সেই ৮০০ টাকা যেদিন প্রয়োজন হইবে আমাকে লিখিয়ো।

আমার বিদ্যালয়ে হঠাৎ ছাত্রদের মধ্যে পানবসন্ত দেখা দিয়েছে। সে জন্য বিশেষ ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। ভয় নাই বটে কিন্তু বিশ্রামও নাই।

এখানে রোজই মেঘ করিতেছে কিন্তু বর্ষণের নাম নাই। বাতাস যজ্ঞবাড়ির মুরুব্বি ব্যক্তির মত নিতান্তই অকারণে চারি দিকে সোঁ সোঁ করিয়া দাপাইয়া বেড়াইতেছে। গ্রীষ্মের উপশম হইয়াছে কিন্তু এ অবস্থায় বর্ষা পিছাইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। তাহা হইলে এবার বাংলাদেশ জুড়িয়া যমদূতের প্যুনিটিভ্‌ পুলিস বসিয়া যাইবে। এখনকার বৃষ্টিতে চাষ হইতেছে ভাল কিন্তু শেষ রক্ষা না হইলে চাষার মাথায় বাড়ি হইবে।

শিলাইদহে কয়দিন ছিলাম। এই বৎসর হইতে সেখানে সুবোধচন্দ্রের রাজত্ব—আমাদের পক্ষে তাহার ফলাফল কি তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে। ইতি—

৩রা বৈশাখ ১৩১৪

তোমার— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[অতএব। আষাঢ় ১৩৭১, পৃ ১৬]

ছিন্নপত্র : ১

মূলপত্রে রচনার স্থান-কালের নির্দেশ নাই। '৩০ অক্টোবর ১৮৮৫' তারিখটি দীর্ঘকাল ছাপা হয়। প্রচল গ্রন্থে (নূতন সংস্করণ ১৩৭৫ ভাদ্র হইতে), ২৪ জুন ১৮৮৬ বা ১১ আষাঢ় ১২৯৩ চিঠি লেখার তারিখ অনুমান করার কারণ দেখানো হইয়াছে গ্রন্থপরিচয়ে। মূল পত্রের গ্রন্থে বর্জিত শেষাংশ—

'আপনাকে আমাদের এখানকার এই বাদলা এবং সমুদ্রের ভাব পাঠিয়ে দিলুম।— আপনি তা হলে এখন গৃহিণী-সঙ্গলোলুপ হয়ে আপনার বাঙ্গলার মধ্যে একটি স্বতন্ত্র নীড় বেঁধে পথ চেয়ে রয়েচেন! শুনে খুসী হলুম। আপনাদের বর্ষার মিলনের আনন্দ ডাকযোগে আমাকেও একটু পাঠিয়ে দেবেন। আপনার বৈষ্ণব কবিতার উদ্ধৃত পদ কয়টিতে খুব বড় কথা আছে। এবং খুব আশার কথাও আছে।

আমার ব্রাহ্মণী ভাল আছেন, এখনও সন্তান লাভের বিলম্ব আছে।

প্রবোধ বেচারার মেয়েটি মারা পড়েছে বোধ করি শুনেচেন।

বাগানের কোন খবর পেলেন? বাগানের জন্তে আমার গৃহিণী স্বদ্ধ ক্ষেপেচেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'

বিরামচিহ্নে এবং ক্রিয়াপদের বানানে (করচে টানচি পারচে আছড়াচ্চে হাসচি স্থলে: করছে টানছি পারছে আছড়াচ্ছে হাসছি) প্রত্যাশিত পরিবর্তন ছাড়া কতকগুলি ছাপার ভুলও আবিষ্কার করা যায় মনে হয় মূল পাঠ ও এযাবৎ মুদ্রিত পাঠ মিলাইয়া দেখিলে। যেমন (দ্রষ্টব্য ছিন্নপত্র, ভাদ্র ১৩৮২)—

ছত্র ২ জানালা < জানলা [মূল পাঠ

৫ বাহিরে < বাইরে

৯ মুখেই < সমুখেই

১৫ পৃথিবীর সৃষ্টির < পৃথিবীসৃষ্টির

২

'তারিখ ঠিক জানিনে। / অক্টোবর। / সোমবার।' মূল চিঠিতে যথাস্থানে পাওয়া যায়। মুদ্রিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদের মধ্যে মূল পত্রে লেখা ছিল:—

'আপনি বাঙ্গলাদেশের শরৎ-শোভার যে রকম বর্ণনা করেচেন আমার লোভ হচ্চে কলকাতায় ফিরে গিয়ে আপনার সঙ্গে ভেসে পড়ি— কিন্তু বোধ করি আমাকে আশ্রয় দেবার মত সে রকম সুবিধে আপনার নেই।

বালকের জন্তে আর আপনি ভাব্‌বেন না— এবারে বালকের বাবার হাতে বালক পড়্‌ল।'

মুদ্রিত শেষ অনুচ্ছেদের পরে ছিল—

'কিন্তু ঠাট্টা যাক্। বন্যাতে কি আমাদের দেশের লোকের বাস্তবিক ভারি কষ্ট হয়েছে? আমার একবার তাদের অবস্থা দেখে আস্‌তে ইচ্ছে করে। যাহোক্ আপনি প্রাণপণে কাজ করুন্, গরীবের আশীর্ব্বাদ কুড়িয়ে নিয়ে আসুন্! আমি যদি পারি কিছু সাহায্য করবার চেষ্টা করব।

আজ তবে প্রস্থান।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'

মুদ্রণপ্রমাদ (কদাচিৎ পাঠভেদ)—

ছত্র ৩	কলিকাতায়	<	কলকাতায়
১০	নীল আকাশে	<	নীলাকাশকে
১৪	প্রকার	<	প্রকাণ্ড
১৬	সুখী	<	খুসী
২০	সেই পুরাতন	<	সেই পরিচিত পুরাতন

৩

গ্রন্থে বর্জিত শেষাংশ—

'আগামী কল্য সাবিত্রী লাইব্রেরীতে আমাদের নিমন্ত্রণ— আপনাকে একটি কদলী ডাকযোগে পাঠান উচিত।

আজ তবে আমাকে বিদায় দিন্।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'

পাঠভেদ—

পৃ। ছ			
১১।১	'আপনার' মূল পত্রে নাই।		
১১।৮	দরকার	<	আবশ্যক
১১।১১-১২	'বালক' কাগজের	<	বালকের
১১।১৬	আমের	<	আঁবের
১১।২১	তন্দ্রাঃ	<	তন্দ্র
১১।২২	তথৈকা	<	তথৈক
১১।২২	বিরহে	<	তন্দ্র বিরহে
১১।২৩	ভাবার্থ	<	ভাবার্থ
১২।৩	ইংরেজিতে	<	ইংরিজিতে
১২।৪-৫	মুঠোর মধ্যে	<	হাতের

৪

গ্রন্থে বর্জিত শেষাংশ—

'প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে আপনার বোধ করি দেখা হয় নি। প্রবোধচন্দ্রের প্রবোধচন্দ্র তাঁর চন্দ্রানন নিয়ে গয়াধাম এবং প্রবোধের হৃদয়াকাশ উজ্জ্বল করে বিরাজ করচেন— এখন আপনার একমুখ দাড়ির বিরহ প্রবোধের অসহ্য বোধ হবে না। শুন্‌চি নাকি সেখানে তিনি পুনশ্চ তাঁর ভাবী পিণ্ডপ্রাপ্তির সুব্যবস্থা করেচেন— তাঁর গয়াবাসিনী অমুক নাকি আবার— !! আপনি খোঁজ নেবেন দেখি কথাটা সত্য কিনা !

আপনার শ্যালকের প্রতি কবিতাটি হয়েছে ভাল— কিন্তু সেটি আপনার এবং আপনার শ্যালকের যতটা ভাল লেগেছে, আমার ততটা ভাল লাগে নি। আজ তবে বিদায়। আমি হয়ত ইতিমধ্যে একবার মেজদাদার কাছে যেতে পারি। শ্রীরবীন্দ্র শর্ম্মা

পুঃ— আজ আমার জন্মদিন— পঁচিশে বৈশাখ— পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এই পঁচিশে বৈশাখে আমি ধরণীকে বাধিত করতে অবতীর্ণ হয়েছিলুম— জীবনে এমন আরও অনেকগুলো পঁচিশে বৈশাখ আসে এই আশীর্ব্বাদ করুন। জীবন অতি সুখের। রবি'

গ্রন্থে ও লেখায় প্রভেদ—

১৩।১ গো < গোবিন্দ
১৪।৩ কোনো < Whitney নামক
১৪।১১ তত্ত্বজ্ঞের < Whitneyর

৫

গ্রন্থে মুদ্রিত শেষ অনুচ্ছেদের বর্জিত শেষাংশ— 'মনে করেছে নভেল লিখ্‌তে গেলেই খুব আড়ম্বর আবশ্যক— সহজ কথা সরল কাহিনীতে কারো প্রাণ গলে না।* আপনার উপরে আমি একটা কাজের ভার দিতে চাই। যথা।— সন্ধ্যাসঙ্গীত প্রভাতসঙ্গীত প্রভৃতি আমার কতকগুলি কবিতাপুস্তক Out of Print হয়ে গেছে। সেগুলো আর ছাপাতে চাইনে। যদি ভবিষ্যতে কখনো ছাপাই— তবে যে কবিতাগুলো যথার্থ ভাল সেইগুলো রেখে আর সমস্ত বিসর্জ্জন দেব। আপনি সমস্তটা পড়ে আপনার কোন্ কোন্ কবিতা বিশেষ ভাল লাগে আমাকে লিখে পাঠাবেন।— বর্ষাকালে তাহলে আস্‌চেন। বর্ষার সময়ে প্রিয়মিলন সঙ্গত কাব্যে পড়া যায়— সেই সময়েই বন্ধুসমাগম বিশেষ ভাল

* / 'ছিন্নপত্র' প্রকাশের প্রাক্‌কালে মূল পত্রে এরূপ চিহ্ন আরোপ করিয়া সচরাচর পরবর্তী অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে দেখা যায়। এজন্য মনে হয়, বর্তমান সংকলনের প্রথম বাক্যটি বাদ দেওয়ার কল্পনা প্রথমে ছিল না।

লাগে। অতএব কথা রইল "আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে !—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'

পাঠভেদ—

১৫।৯-১০ পর যদি বিনা উত্তরেই < পরে যদি আবার বিনা উত্তরেই আপনাকে

১৫।১০ লিখি তবে < লিখি তা হলে

১৫।১৮ আম < আঁব

১৫।২০ তরল < গভীর

১৫।২১ অবিশ্রান্ত < অবিশ্রাম [পরের বাক্যে 'অবিশ্রাম'এর পুনঃ প্রয়োগ।

১৬।১১ সেখানে < সেখেনে

১৬।১৩ তাঁরা < তারা

১৬।১৪ পারতেন, তাঁদের < পারত, তাদের

১৬।শেষ কেউ < কেহ

৬

মূল চিঠিতে মুদ্রিত শেষ বাক্য ও তাহার অনুবৃত্তি এরূপ—

'আমাদের মহদ্‌দৃষ্টান্ত অল্পই আছে এবং যা আছে নানা কারণে আমাদের নজরে পড়ে না সেগুলো যাতে আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ে সে চেষ্টা করা উচিত। আমরা ভালবেসে ভাল হই— উপদেশের দ্বারা হইনে— যদি ভাল লোকের উপর আমাদের ভালবাসা জন্মিয়ে দিতে পারেন তা হলে আমাদের অনেক মঙ্গল হয়। বাস্তবিক আপনার চিঠিতে শরৎসুন্দরীর কথা পড়ে আজ আমার হৃদয়ের অনেক তৃপ্তি এবং উপকার হয়েচে।

আমার কন্যার এখনো নামের জোগাড় হয় নি। কি নাম দিই আপনি বলুন দেখি। তাকে বাড়ির সকলে "বেলা" বলে ডাকে। আপনার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পরিচয় করে হবে। আপনার সুমহৎ দাড়ি একবার করায়ত্ত করতে পারলে তাঁর কৈশিকাকর্ষণের সাধ একরকম মিটে যায় বোধ করি। কাছাকাছি আপনাদের কি কোন ছুটি নেই? মাঝে মাঝে দেখাশুনো করতে ইচ্ছে করে— কিন্তু ব্যস্তভাবে নয় – বেশ একটু জমে বসে গড়িয়ে তাকিয়া ঠেসান্ দিয়ে। কিন্তু বোধ করি বহুকাল আর তেমনটি হবে না

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'

'সপ্তাহ / নামক / সাপ্তাহিক / পত্র বাহির / হইবার / সংকল্প / উপলক্ষে'— অনুমান হয় রবীন্দ্রনাথ এই 'কপাল-টুকনি' লেখেন ছিন্নপত্র-সম্পাদনার সময়ে। গ্রন্থে ও পাণ্ডুলিপিতে পাঠভেদ—

১৭।১২-১৩ এসেছে, দক্ষিণের < এসেছে, আমের বোল দেখা দিয়েছে— দক্ষিণের

১৭।১৭ বেঁচে < থেকে

৭

সপ্তম ছত্রে 'পারি নে।' এই বাক্যশেষে আর-একটি বাক্যের স্থান মূল চিঠিতে: পা টন্‌টন্‌ করে। / পাঠভেদ—

১৯।৬ বিছানা < বিছেনা

১৯।১০ কোমরের < কোমরে

১৯।১৫ উপর < উপরে

১৯।১৬ কারও < কারু

৮

মুদ্রিত পাঠের অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপি-ধৃত শেষাংশ—

'ক্ষান্ত হওয়া গেল। আপনার বিস্তর কাজ। আপনাকে অবসর দিলুম। গত পরশ্ব মদীয় কন্যার নামকরণ হয়ে গেছে। নাম মাধুরীলতা। আপনি উপস্থিত ছিলেন না।

শ্রীশানী কেমন আছেন? প্রবাসমিলনের এক সুবিধা এই যে কারো আড়ি পাতবার কোন সম্ভাবনা আছেন [নেই]— আপনারা আছেন ভাল, অন্য সকলের চোখের আড়ালে চোখে চোখে। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আপনার / ছুটি কবে? / সেই পূজার সময় কি? / শ্রী'

সংকলিত শেষ অনুচ্ছেদ এ চিঠির প্রথম পৃষ্ঠার শিয়রে বিন্যস্ত হয় 'পুনশ্চ' হিসাবে। সম্পূর্ণ স্বাক্ষরের পূর্ববর্তী বাক্যে 'নেই' বা 'নাই' স্থলে 'আছেন' লেখা লিপিপ্রমাদ মাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থে ও পাণ্ডুলিপিতে পাঠভেদ—

২১।৫ কুড়ির কোঠার < কুড়ি-কোঠার

২১।১৫ এবার < এবারে

২২।১৪ এ একরকম মন্দ নয়। জীবনের < একরকম মন্দ নয়। Nomadic জীবনের অস্থির বৈচিত্র্য ত্যাগ ক'রে গৃহীজীবনের [কপি-ছাড়?

২২।১৯ করছে < কচ্চে

২৩।১ বাদরে < বাদরে মাহ ভাদরে

২৩।১৪ বিশেষরূপে < বিশেষরূপ

২৪।১২ কিংবা < কিম্বা

কবিতার বিভিন্ন ছত্রে অসমাপিকা ক্রিয়াপদগুলির বানান বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের আদর্শে করা হয়, যথা, পড়্যে এল্যে লয়্যে গুল্যে কর্যে / মুদ্রণকালে য-ফলা বর্জিত।

সাধারণভাবে জ্ঞাতব্য, এই আটখানি চিঠির প্রত্যেকটির শীর্ষে প্রণব 'ওঁ' লেখা আছে আর সম্বোধন হিসাবে লেখা হয় যথাক্রমে— বন্ধুবর (১ ও ৬), সুহৃদ্বরেষু (২), সাব্‌ ডেপুটি সা'ব (৩), সুহৃদ্বর (৪, ৫, ৭ ও ৮)

আলোচনা

মোলিয়্যারের ত্রৈশতাব্দিক উৎসব

আমি মোলিয়ারের বিষয়ে এক-রকম অনভিজ্ঞ। তাঁর সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান তা দাদার বাংলা অনুবাদ ও সমালোচনার ভিতর দিয়ে হয়েছে; আর, বোধ হয় মোলিয়ারের ইংরাজি অনুবাদও কিছু কিছু পড়েছি। সাহিত্যের কোনো ভালো রচনা ভাষান্তরিত হলে তা বিকলাঙ্গ হয়ে যায়, সেই অনুবাদে সৌন্দর্য রক্ষিত হয় না, এ বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে। অনুবাদের ভিতর দিয়ে লেখকের সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচয় হয় না এবং সে পরিচয়কে অবলম্বন করে সমালোচনা করাও কঠিন। আমাদের ফরাসী ভাষার অধ্যাপক মরিস সাহেব স্বয়ং মাদাম লেভির কাছে মূল মোলিয়ার পড়ছেন, সুতরাং এ বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ এবং তাঁর বক্তৃতায় আমরা নাট্যকার সম্বন্ধে অনেক পরিচয় লাভ করেছি। আজ আমি সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু বলব।

মরিস সাহেবের বক্তৃতার এক জায়গায় তিনি বলেছেন যে, মোলিয়ার সম্বন্ধে এরূপ দোষারোপ কেউ কেউ করেন যে তিনি যে-সকল পাত্রের চরিত্র চিত্রিত করেছেন, অতি-শয়োক্তির দ্বারা স্বাভাবিকতার সীমা লঙ্ঘন করে তাদের দেখানো হয়েছে। এই উক্তির প্রতিবাদ বা সমর্থন করা আমার সাধ্য নয় কিন্তু এই বাদানুবাদ সম্বন্ধে আমি মোটামুটি কিছু বলতে পারি।

শিল্পী একটা বিশেষ প্ল্যানকে নির্বাচন করে তাঁর কাজ করেন। তিনি যা গড়ে তুলবেন তার সমগ্রতার রূপ তাঁর মনে আছে, তাকে জাগিয়ে তোলবার জন্য তিনি বহির্জগতের থেকে সব জিনিষকে অবিকল গ্রহণ করে একত্র সংগ্রহ করেন না। তিনি কতক ত্যাগ করেন কতক গ্রহণ করেন— তাদের নিয়ে এমন সংলগ্ন সঙ্গত একটা চিত্র সৃষ্টি করেন যা তাঁর মনের পরিকল্পনার অনুরূপ। বাইরে যা দেখছি তার প্রতিলিপি তৈরি করলে তা যথার্থ আর্ট্ বলে গণ্য হয় না। সেক্স্‌পীয়ারের ট্র্যাজেডি 'ম্যাক্‌বেথ' বা 'হ্যাম্‌লেট'এর বর্ণিত ঘটনা বাইরের বিশ্বে কখনো এত বেশি সুসংলগ্ন ও নিবিড়ভাবে ঘটে না। শোক দুঃখ, চিত্তের আবেগ, চিত্তদাহ, এমন উজ্জ্বলভাবে তিনি চিত্রিত করেছেন যে বাস্তব জগতে তা এমন করে প্রকাশ পায় না। কারণ, প্রকৃতিতে ছেদ আছে, শোকদুঃখ অমন সংহতভাবে দেখা দেয় না। সংসারে চলতে ফিরতে নানা-প্রকার আলাপ-আলোচনা ছোটো বড়ো নানাবিধ কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে সেই শোকদুঃখ বিস্তৃত হয়ে যায় বলে তার তীব্রতা চোখে পড়ে না। কিন্তু কবি তাদের এমন সুব্যক্ত সুদৃঢ় করে তাঁর ট্র্যাজেডি লেখেন যে সমস্ত উপাদান আমাদের সামনে নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘনীভূত হয়ে দেখা দেয়। রাজা লীয়ার ঝড়ের মধ্যে গিয়ে বিদূষকের সঙ্গে যে-রকম-ভাবে বাক্যালাপ করলেন, পাগলেও তেমন করে না। এই-যে

এখানে বাস্তব জগতের হিসাবে অতিশয়তা প্রকাশ হয়েছে, এটা কাব্যজগতের পক্ষে অতিশয় হয় নি। অতএব কাব্যে কোন্ অতিশয়োক্তি সত্য ও কোন্‌টা অসত্য তার একটা আদর্শ আমাদের মনে থাকা চাই। একটা বাহ্যিক প্রাসঙ্গিক ও আকস্মিক ব্যাপারকে যদি বেশি প্রাধান্য দান করা হয় তবে সাহিত্যে তা সয় না। যেমন একজন পাত্রের খুঁড়িয়ে হাঁটা যদি রকমকে দেখানো যায় তবে তাতে লোককে হাসানো যেতে পারে কিন্তু এতে কোনো নিত্য সত্যকে প্রকাশ করা হয় না। এরকম বাড়াবাড়িকে trick বা কৌশল বলা যেতে পারে কিন্তু তাতে কোনো পাত্রের চরিত্রের কোনো সত্য উপাদান দেখানো হয় না।

শিশু মনে এমন করে ভাবে, বিশ্বকে এমন করে দেখে যে তার মধ্যে আমরা অসঙ্গতি দেখতে পাই, আমাদের হাসি পায়। এই অদ্ভুত অসংলগ্নতাই শিশুস্বভাবের চিরন্তন লক্ষণ। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কিছু না কিছু পরিমাণে এই শিশু আছে— আমাদের সমস্ত চিন্তা সমস্ত আচরণই যুক্তিসঙ্গত নয়। এই অসঙ্গতি এই অযৌক্তিকতা যেখানে মানবচরিত্রের কোনো-একটি ব্যাপক পরিচয় দেয় সেইখানেই সে হাস্যরসের বড়ো রকমের উপাদান যোগায়। আর, যেখানে সে নিতান্ত অগভীর, যেখানে সে মানবচরিত্রের একটা অবান্তর বিষয় মাত্র, সেখানে সেটাতে কেবল ভাঁড়ামি প্রকাশ করা যায়।

মোলিয়ারের বিষয়ে আমার যতটুকু জ্ঞান আছে তাতে এ কথাই বলতে পারি যে, তিনি যে খ্যাতি লাভ করেছেন শুধু ভাঁড়ামি করলে সেই-পরিমাণ খ্যাতি পাওয়া যায় না। কোনো পাত্রের তোৎলামিতে লোকে হেসে অস্থির হতে পারে কিন্তু তাতে যথার্থ সাহিত্য-রসনৈপুণ্যের যশ লাভ করা যায় না। প্রতি পাত্রের গভীর প্রকৃতিতে এমন একটা হাসি বা কান্নার দিক আছে যাকে স্থায়ী প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করলে সে ম্লান হয় না। যা আকস্মিক তাকে অত্যুক্তির দ্বারা উৎকটভাবে প্রকাশ করলে যে ক্ষণিকভাবে আপাত ফল ফলে না তা নয়— এতে লোককে হাসানো আর কাঁদানো যেতে পারে। তার দৃষ্টান্ত, আমাদের দেশে বক্তৃতাতে 'মা' শব্দ বারংবার ব্যবহার করলে শ্রোতার চোখে জল আনা খুবই সহজ, কেননা বাঙালি-সন্তান হচ্ছে মায়ের আদুরে সন্তান এবং নাটকে নভেলে সতীত্বের অত্যুক্তিপূর্ণ চিত্র আঁকলেও পাঠকের মনকে উচ্ছ্বসিত করে দেওয়া যায়, কেননা বাঙালি স্বামীর প্রধান গৌরব হচ্ছে স্ত্রীর কাছে পূজা আদায় ক'রে। এই মনের অভ্যাসের অনুবর্তনে লোককে উত্তেজিত করা খুব সহজ ব্যাপার কিন্তু সেটা নিত্য সাহিত্যের যোগ্য বিষয় নয়। স্থানিক সাময়িক কোনো বিশেষহৃদয়গত অভ্যাসকে আঘাত করে যে-একটা সস্তা রকমের হৃদয়াবেগ উৎপন্ন করা যায়, কোনো বড়ো প্রতিভাশালী লেখক সেই-সব খেলো জিনিষ নিয়ে কখনো সাহিত্যসৃষ্টি করেন না।

মোলিয়ারের 'ল্য বুর্জোয়া জ্যাঁতিয়ম' নামক নাটকের অনুবাদ 'হঠাৎ নবাব'টাই ধরা যাক। অকস্মাৎ কেউ অনেক টাকা পেলে তার কেমন মনের বিকার হয়, এটাই এর মূল কথা নয়। কিন্তু এতে দেখানো হয়েছে যে, একজন 'হঠাৎ নবাব' ধনীব্যক্তির চাল-চলন

লক্ষ্য করে তার অনুকরণের যে দুঃসাধ্য চেষ্টা করে সেটা কী জিনিষ। সেই অনুকরণের চেষ্টা মানুষের মধ্যে একটা সাধারণ ব্যাপার— সে একজন ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ বিকৃতি নয়। তাই এই অনুকরণ প্রায়ই অসঙ্গত আকার ধারণ করে, তাই মানুষের পক্ষে এ একটা চিরকেলে হাস্যরসের বিষয়। সকল দেশেই সকল কালেই এই হাস্যরসের উপাদান মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়— অন্তরের মধ্যে যে জিনিষটাকে পাওয়া যায় নি, বাইরের উপকরণ দিয়ে সেইটেকে কৃত্রিমভাবে খাড়া করে লোককে ভোলাবার অপরিমিত প্রয়াস আমরা নানা জায়গায় নানা প্রকারেই দেখে থাকি আর তাই নিয়ে হাসাহাসি চলে।

'হঠাৎ নবাব' নাটকটাকে এই হিসাবে অত্যুক্তিপূর্ণ বলা যেতে পারে যে, তাতে অল্প পরিসরে অনেকখানি হাসির উপাদান ঘনীভূত করে দেখানো হয়েছে। পূর্বেই বলেছি, বাস্তব সংসারে এই-সকল হাস্যকর ব্যাপার বিরল বিকীর্ণ হয়ে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয়। মোলিয়ার তাকেই বেছে নিয়ে নিবিড় করে সাজিয়ে তুলেছেন। এই সাজিয়ে গড়ে তোলাতেই শিল্পীর বাহাদুরি। করুণ রসকে ব্যক্ত করতে হলেও শিল্পীকে এমনি ঘনীভূত চিত্র আঁকতে হয়। এই দুই ক্ষেত্রে বিচার করে দেখা দরকার যে, যা আকস্মিক, যা উপরে উপরে ভাসছে, তাকে অবলম্বন করা হয়েছে না স্বভাবের গভীরতর লক্ষণগুলিকে অবলম্বন করা হয়েছে।

—শান্তিনিকেতন পত্র। চৈত্র ১৩২৮। পৃ ৩০-৩২

দ্রষ্টব্য পৃ ৩০, দ্বিতীয় কলমে শেষ দুই ছত্র : 'গত ফাল্গুন সংখ্যায় শান্তিনিকেতনের এই উৎসবের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। এতদুপলক্ষ্যে আচার্য্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।'

ফাল্গুন ১৩২৮, পৃ ২৬। ক ১। শেষ অনুচ্ছেদ হইতে : 'ফরাসী হাস্যরসিক নাট্যকার মোলিয়্যারের ত্রৈশতাব্দিক উৎসবে বিশ্বভারতী সম্মিলনীর বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। গুরুদেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।··· অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পেস্‌টনজি হিরজিভাই মরিস··· মোলিয়্যারের জীবনী ও লেখার সহিত শ্রোতৃমণ্ডলীর পরিচয় সাধন করিয়াছেন [করিয়া দেন]। অতঃপর অধ্যাপক লেভি মূল ফরাসী ভাষায় মোলিয়্যারের একটি সনেট ও একটি ব্যঙ্গনাট্যের একটি দৃশ্য পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন। তাঁহার আবৃত্তি বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। সব শেষে গুরুদেব··· তাঁহার মত ব্যক্ত করেন।'

শেলি[1]

আজকে শেলির, ইংরেজ কবি শেলির, শতাব্দী স্মরণ-সভা আমাদের এখানে। এই সভার কার্যভার আমার উপরে দেওয়া হয়েছে, আমি তা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছি। তার একটা প্রধান কারণ এই, যে কবির জন্ম হয়েছিল সুদূর সমুদ্রতীরে য়ুরোপে তাঁকে আজ আমরা আমাদের আপন বলে স্বীকার করব।

যাঁরা পৃথিবীতে কোনো একটা বড়ো সৃষ্টির কাজ করেছেন— কোনো সৌন্দর্যকে আকার দিয়েছেন, কোনো মহৎ ভাবকে প্রকাশ করেছেন জীবনে বা সাহিত্যে বা কোনোরকম ললিতকলায়, তাঁরা কোনো বিশেষ দেশের অধিবাসী নন। এই কথাটা আজকের দিনে আমাদের স্মরণ করবার সময় উপস্থিত হয়েছে। যারা নিজের দেশের জন্য ধনোপার্জন করে, নিজের দেশের প্রতাপ বৃদ্ধি করবার জন্য দিক্‌বিদিকে জয়পতাকা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তারা তাদের নিজের দেশেরই লোক— তাদের অন্য দেশে প্রবেশের সহজ অধিকার নেই। কিন্তু পৃথিবীর যেখানে যে-কোনো মানুষ সত্যকে সুন্দরকে কল্যাণকে বড়ো করে দেখিয়েছেন তিনি সকল দেশের অধিবাসী, সকল কালের লোক। আমাদের সম্পূর্ণ মন মুক্ত ক'রে. সকল-রকম কুণ্ঠা দূর ক'রে এ কথা স্বীকার করতে হবে। তা যদি না স্বীকার করি তা হলে সমস্ত মনুষ্যসমাজের মধ্যে আমাদের যে স্থান আছে সেই স্থানকেই অস্বীকার করা হবে। তা হলে এই কথা বলতে হয় যে, পৃথিবীতে আমরা জন্মগ্রহণ করি নি, আমরা কেবলমাত্র নিজেরই এই ক্ষুদ্র দেশের চতুঃসীমানার ভিতর জন্মেছি যা বেড়া দিয়ে আমাদের অন্তরায়ণের দণ্ডে দণ্ডিত করেছে। এই কথাটা আমরা যেন অন্তরের সঙ্গে বলতে পারি যে, সেই দণ্ডগ্রহণের আমরা যোগ্য নই। যদি যোগ্যতা প্রমাণ করে থাকি— যদি এমন মূঢ়তা নিয়ে আমরা গৌরব করে থাকি যে, পৃথিবীর আর কোনো মহাজনের সঙ্গে আমাদের যোগ নেই, অন্য দেশের যা সৃষ্টি যা কর্ম যা চিরন্তন সম্পদ আমরা তাকেও সদর্পে প্রত্যাখ্যান করে থাকি, তবে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এবং বোধ হয় করেওছি— অনেক দিন ধরে করেছি। কিন্তু সময় উপস্থিত হয়েছে যখন এমন করে নিজেদের চারি দিকে এইরকম একটা মানসিক গণ্ডী টেনে সেইটিরই ভিতরে শুদ্ধ হয়ে বসে থাকাকে যেন আত্মাবমাননা বলে অনুভব করি।

এই-যে শতাব্দীকালের পরে এই কবিকে স্বীকার করবার জন্যে আমরা বসেছি এর ভিতর একটা বড়ো কথা হচ্ছে এই যে, শতাব্দীর দূরত্ব তাঁর পক্ষে খাটে না। বরঞ্চ এমন একটা আশ্চর্য স্বতোবিরুদ্ধতা দেখছি যে, যে কালে তাঁর জন্ম হয়েছিল সে কালে তিনি পৃথিবীর লোকের যত নিকট ছিলেন এই শতাব্দীর পরে তার চেয়ে তিনি বেশি নিকটতর হয়েছেন। এ যেন এমন একটা জ্যোতিষ্কের কথা যার আলো এসে পৌঁছতে সময় লেগেছে। কালের ব্যবধান তাঁর পক্ষে উত্তরোত্তর বেড়ে না চলে ছোটো হয়ে এসেছে।

[1] খৃস্টীয় ৮ জুলাই ১৯২২ (২৪ আষাঢ় ১৩২৯) তারিখে কলিকাতায় 'শেলির মৃত্যুশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে' 'বিশ্বভারতী-সম্মিলনীতে··· সভাপতির বক্তৃতা'।

আর একটি কথা এই যে, তিনি যে দেশে জন্মেছিলেন সে দেশে তাঁর স্থান হয় নি। সে দেশ থেকে দূরে নির্বাসনে তাঁকে অধিকাংশ জীবন কাটাতে হয়েছিল। এই দেশছাড়া লক্ষ্মীছাড়া মানুষটি আজকে সকল দেশেই তাঁর দেশ পেলেন। পৃথিবীর অধিকাংশ মহাপুরুষই তো নির্বাসনের সিংহদ্বার দিয়ে সমস্ত পৃথিবীতে আপন অধিকার লাভ করেন। সাময়িক মানুষেরা তাঁদের যে তাড়িয়ে দিয়েছে, বলেছে 'তুমি আমাদের আপনার নও', সেই বলার ভিতর একটা বড়ো কথা রয়েছে। উপস্থিত সময়ে যিনি একটা উপস্থিত ক্ষেত্রকে অধিকার করেন, কালক্রমে সর্বদেশের অধিকার তাঁর ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। কিন্তু সকলের চেয়ে যাঁরা বড়ো তাঁদের সম্বন্ধে এই দেখতে পাই যে, তাঁদের সাময়িক লোকে তাঁদের নির্বাসনে দিয়েছে তার কারণ, তাঁরা সংকীর্ণভাবে কোনো দেশের বা কোনো কালের মন জোগাতে পারেন নি। তাঁরা এমন একটি বাণী এনেছেন যা সকল কালের সকল দেশের; এইজন্য সামান্য ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে সেই বাণী আপনার স্থান পায় না। এই-সকল মহাপুরুষেরা নগদ মজুরি কখনো পান না। জীবিতকালে যশের দিক থেকে সম্মানের দিক থেকে প্রবাসী হয়ে থাকেন, উপবাসী হয়ে জন্ম কাটান।

ইংলণ্ডের এই কবিকে একদিন তাঁর দেশের লোকেরা 'নাস্তিক' 'সমাজদ্রোহী' ব'লে কলঙ্ক আরোপ করে তাঁর কবিত্বকে পর্যন্ত খর্ব করে তাঁকে দূর করে দিয়েছিল। আমি বলি যে, ভালো করেছিল। সেই ছোটো দেশের মধ্যে তাঁর স্থান তো নয়। এইজন্য নির্বাসন তাঁর পক্ষে দিগ্‌বিজয়ের সিংহাসন। সেই সিংহাসনের উপরে যাঁর প্রতিষ্ঠা তাঁকে আজ আমরা আমাদের আপন বলে অনুভব করব— ক'রে আমরাও আমাদের চারি দিকে দৈশিক ও সাময়িক যে ব্যবধানের স্তর আপনি আপনি জমে উঠছে তার ভিতর একটুখানি ফাঁক করে দিতে পারব। গণ্ডী আমাদের অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছে। আমরা এই কথা বলবার চেষ্টা করেছি যে, আমাদের আপনাতেই আপনার সার্থকতা পর্যাপ্তি আছে। এমন কথা আমরা বলেছি যে, আমাদের সাহিত্যই একমাত্র আমাদের সাহিত্য, আমাদের ভাগ্যে আর যেন কোনো সাহিত্য নেই; আমাদের তত্ত্বজ্ঞানই একমাত্র আমাদের তত্ত্বজ্ঞান, তার বাড়া আর তত্ত্বজ্ঞান আমাদের পক্ষে হতেই পারে না; এমন-কি বিজ্ঞান সেও আমাদের নয়, সে আর-কোনো দেশের। এটার ভিতর যে কত অসত্য আছে, মনের অভিমান-বশতঃ ক্ষোভ-বশতঃ আমরা সেটা ভালো করে বুঝতে পারি নি। আমাদের প্রত্যেকের জন্য তপস্যা করেছেন সকল দেশের তপস্বী এ কথা যখন ভাবি, তখন হৃদয়ের কত বড়ো প্রসার হয়। মানুষকে মানুষ ব'লে আপন ব'লে জানলে পর তাতে কত বড়ো শক্তি। আমাদের দেশে আমাদের অধিকারের সংকীর্ণতাকে আমরা দোষ দিয়ে থাকি। কিন্তু রাষ্ট্রতান্ত্রিক সংকোচই যে সংকীর্ণতা তা তো নয়, তার চেয়ে ঢের বড়ো সংকীর্ণতা হচ্ছে মনের অধিকারের সংকীর্ণতা। আমি যদি বলি আমার মন কবিকঙ্কণের বাইরে যাবে না, আমার মন দাশুরায়ের পাঁচালি ছাড়াবে না, এমন-কি বৈষ্ণব পদাবলী ছাড়া আমার

পক্ষে আর গীতিকাব্য নেই, তবে অবজ্ঞার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করতে হবে সমস্ত বিশ্বের যে শ্রেষ্ঠ দান বিশ্ব আমার হাতে তুলে দিয়েছে এবং আমাকে বলছে— 'আমি তোমার'।

মানুষ হচ্ছে বনস্পতি। অন্য যে-সব জীবজন্তু তারা ঘাস কি ছোটো গুল্ম হতে পারে কিন্তু মানুষ হচ্ছে বনস্পতি। মানবচিত্তের শিকড় বহুদূরগামী, বহুশাখাবিশিষ্ট। মহামানবের মানসক্ষেত্রের ভিতর গভীরভাবে এবং প্রশস্তভাবে সে যদি প্রবেশলাভ করতে না পারে, সমস্ত মানুষের চিত্তক্ষেত্র থেকে আপনার রস আহরণ করতে না পারে, নিশ্চয় সে মন ক্ষীণ হয়ে যায়, বৃদ্ধি তার কখনোই হতে পারে না— তার বুদ্ধির, ধর্মবুদ্ধির, চরিত্রনীতির উন্নতি হতে পারে না। আমরা যে অনেক আত্মাবমাননা স্বীকার করে নিয়েছি, অন্ধ বশ্যতায় যে কেবলমাত্র শাস্ত্রবচন বা গুরুর বাক্যকে মাথায় করে নিয়েছি, এমনভাবে গতানুগতিকের মতন যে জীবনহীন হয়ে চলতে পেরেছি— কেন? মহামানবের চিত্তক্ষেত্র থেকে আমাদের পূর্ণ খাদ্য আহরণ করতে না পারায় আমাদের মন নির্জীব হয়েছিল বলেই সকল কথাই নিশ্চেষ্টভাবে মেনেছি— রাষ্ট্রীয় শাসন, সামাজিক শাসন, শাস্ত্রীয় শাসন সমস্তই মাথা হেঁট করে স্বীকার করতে পেরেছি। বিচার করতে চাই নি, কেননা বিচারবুদ্ধির জন্যে মনের প্রাণশক্তির দরকার। অধীনতার যে-সমস্ত দুর্গতি থেকে আজ আমরা এত কষ্ট পাচ্ছি সে-সমস্তের মূল হচ্ছে মনের নির্জীবতা। মনকে সজীব সবল ও সচল করতে হলে মনের খাদ্য সম্পূর্ণরূপে দিতে হয়। কোনো বাইরের অনুষ্ঠান বাইরের যান্ত্রিক কোনো একটা ক্রিয়া দ্বারা আমাদের মন কখনোই জীবন লাভ করতে পারবে না। পৃথিবীর যেখানে যা-কিছু বড়ো আছে, যার ভিতর অমরতা আছে, সেই সমস্ত নিলে পর তবে আমাদের মন অমৃত-খাদ্য লাভ করবে এবং সেই অমৃতের দ্বারাই সে বড়ো হয়ে উঠবে— আর-কিছু দ্বারা নয়। মৈত্রেয়ী যে বলেছিলেন 'যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্' সে কেবল আধ্যাত্মিকতার দিকেই নয়, সমস্ত দিকে— বিদ্যার দিকে জ্ঞানের দিকে সমস্ত দিকেই খাটে। সমস্ত পৃথিবীর একটা অমরাবতী আছে যেখানে অমৃত উৎসারিত হচ্ছে। যে-সকল সাধকের মন্ত্রবলে তপস্যাবলে তা হয়েছে তাঁরা যে দেশেই থাকুন একই অমরাবতীর লোক। সেই অমরাবতী সকল দেশেই আছে। সেই অমরাবতীর লোক যেমন কালিদাস, সেই অমরাবতীর লোক তেমনি শেলি কি শেক্স্পিয়র— তাঁদের কাছে যেতে হবে। বলতে হবে, 'হাত পাতলেম, গণ্ডূষ করলেম, দাও।' তবে আমাদের মন আপনার খাদ্য পাবে এবং শক্তি লাভ করবে। এই কথাটা মনে রেখেছি ব'লে আজকার দিনে এই অন্য দেশের যিনি, এমন-কি যে দেশের সম্বন্ধে আমাদের মনের ভিতর স্বাভাবিক বিরোধ আছে সেই দেশের যে-একটি কবি, তাঁকে আজ আমাদের এই সভাতে, এই আমাদের বাংলা ভাষার বাংলা দেশের সভাতে আজ আহ্বান করলেম। এখানে তাঁর আত্মাকে আমরা অনুভব করলেম, এখানে আমাদের মধ্যে তিনি তাঁর স্থান গ্রহণ করলেন।

তার পরে কবির সঙ্গে পরিচয়। কালের দূরত্ব এবং দেশের দূরত্ব কম নয় কিন্তু তার

চেয়ে আর-একটা বড়ো দুরত্ব হল ভাষার দূরত্ব। আমরা ইংরেজি ভাষা বাল্যকাল থেকে পড়ছি, শিখছি, তার ব্যাকরণ সম্বন্ধে আমাদের হয়তো ভুল না'ও হতে পারে। কিন্তু এ কথা জোর করে বলা যায় যে, ইংরেজি ভাষায় যে-সব বড়ো বড়ো কাব্য আছে, গীতিকাব্য বিশেষতঃ, তার সম্পূর্ণ রস গ্রহণ করবার অধিকার বিদেশীর পক্ষে দুর্লভ। আমার নিজের একটি অভিজ্ঞতার কথা আমি বলছি য়ুরোপের সংগীত সম্বন্ধে। এটা আমি দেখলেম যে, যে সংগীতে বিদেশের সমস্ত বড়ো বড়ো লোক আনন্দিত হলেন তার মধ্যে আমাদের প্রবেশ সহজ নয়। অথচ সেই সংগীতের গৌরব যে সে দেশে কতখানি তা আপনারা জানেন। তাঁদের যাঁরা বড়ো বড়ো গায়ক কি যাঁরা বেহালা কি অন্য কোনো বাজনা ভালো বাজাতে পারেন তাঁদের এক জনের এক রাত্রির যে আয়, তা আমাদের দেশের [অনেকের] সমস্ত বছরের আয়ের দ্বিগুণ চতুর্গুণ হয়। আর তাঁদের সেই গান কি বাজনা শোনবার জন্য হয়তো এক বছর আগে থেকে লোক আপনার জায়গাটি কিনে ভিড় ঠেলে দ্বারের কাছে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। অথচ দেখলেম, সেই সংগীতের ভিতরকার যে রসটুকু সে আমার মতন বিদেশীর পক্ষে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা কঠিন। অবশ্য দীর্ঘকাল শুনে শুনে অভ্যাস হয়ে গেলে পর ক্রমে বোঝা যায় যে, এই সংগীতের একটা মাহাত্ম্য আছে। সেটি দুই দিক থেকে বোঝা যায়। এক বোঝা যায়, যখন দেখি যে এরা কত গভীরভাবে এর রস গ্রহণ করছে। আর-একটি দিক থেকে দেখা যায় যে, শুনতে শুনতে তার ভিতরকার কিছু কিছু রস আমাদের অন্তঃকরণকে যে একেবারে স্পর্শ করে না তা নয়। আমি আমার কথা বলছি। অল্পদিন হল আমি য়ুরোপে যখন গিয়েছিলেম, সেখানকার একজন গুণী বেহালা-বাদয়িত্রী বিশেষ করে আমাকে কুড়িটি কি বাইশটি, কিছু বা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কিছু বা আধুনিক, সংগীত-রচনা শোনালেন। সেই রাত্রিতে আমি নিঃসন্দেহে এটা অনুভব করলেম যে, এই সংগীত অবহেলা করবার নয়। এর ভিতর খুব একটি গভীর শক্তি আছে এবং সৌন্দর্য আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে একটি সন্দেহ উপস্থিত হল। মনে হল যে, আপনি যা বুঝলেম আর-একজন য়ুরোপীয় সেটাকে সেইরকম বোঝেন কিনা সন্দেহ। দেখতে পাচ্ছি যে, সংগীতের যে-একটি ক্ষেত্র আছে তার ভিতর প্রবেশ করা বাইরের লোকের পক্ষে বড়ো কঠিন। ছবিতে বরঞ্চ অত বাধে না। য়ুরোপীয় যে-সমস্ত ছবি আমরা দেখি তাতে আমাদের তেমন বাধা ঠেকে না। কিন্তু গানে বাধা কিছু বেশি। ওর একটা ইডিয়ম আছে, সেটা যখন আয়ত্ত না করতে পেরেছি তখন তার ভাষার ভিতর তার ভাবের ভিতর মনের প্রবেশ সম্পূর্ণ হয় না। একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, গীতিকাব্যের একটি প্রধান জিনিষ হচ্ছে গীতি, তার গান। কাব্য আপনার সংগীত আপনি বহন করে। সেই সংগীতটি যে কেবল ধ্বনির সংগীত এ কথা মনে করা ভুল হবে। কতকগুলি ল'কার দিয়ে— যেমন 'ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে'— এক-রকম ধ্বনিলালিত্য গড়ে তোলা হয় সেটা হচ্ছে অত্যন্ত বাহ্যিক, সেটা গভীর নয়। কালিদাসের কাব্যে আমরা যে

শব্দসমাবেশ পাই তার মধ্যে ধ্বনিসংগীতের চেয়ে ভাবসংস্থানের সংগীত বড়ো। ভাষার প্রাণবান শব্দের মধ্যে যে ভাবপ্রসঙ্গ আছে সেই ভাবপ্রসঙ্গের সংগীত বিদেশীর পক্ষে সম্পূর্ণ বোঝা শক্ত।

এইজন্য আমার সন্দেহ হয় যখন কোনো বিদেশী কবির কাব্য আমরা পড়ি, তার ভিতরকার অনির্বচনীয় মাধুর্যের অনেক অংশ বাদ পড়ে যায়। সুতরাং শেলির গীতিকাব্যের যে গীতি-অংশ আছে সেটা সম্বন্ধে বেশি আলোচনা করতে ইচ্ছা করি নে। তবে এ কথাও সত্য যে, ইংরেজি ভাষা বারম্বার পড়ার দ্বারা সেই ভাষার ভিতর আমাদের অনেকটা প্রবেশলাভ হয়েছে। এমন-কি তার সংগীতভাণ্ডারের প্রান্তেও আমরা আসন বোধ হয় পেয়েছি। সেইজন্য শেলির কাব্যের ভিতর একটি যে অসামান্য গীতিরস রয়েছে সেটা যে আমাদের মনে লাগে না এ কথা আমি সম্পূর্ণ স্বীকার করি নে। খুব লাগে। আমি শুনেছি ইংরেজ সমালোচকেরা বলেন যে, শেলি হচ্ছেন কবিদের কবি। 'কবিদের কবি' বললে এইটে বোঝা যায় যে, কবিরা যে উপকরণ নিয়ে তাঁদের ভাব প্রকাশ করেন সেই উপকরণের উপর শেলির যে কী আশ্চর্য প্রভুত্ব ছিল সেটা কবিরা বিশেষ করে বুঝতে পারেন, যেহেতু তাঁদের সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে।

শেলি ভাষার শব্দগুলিকে যেন মন্ত্রবলে কাব্যরচনায় খাটিয়ে নিতে পারেন। এই শক্তি যখন কোনো-একজন কবি আর-একটি কবির ভিতর দেখেন তখন তিনি কেবলমাত্র কাব্যের কাব্যসামগ্রীর নয়, কাব্যকলার যে গুণ সেটাও নিবিড় করে অনুভব করেন। শেলির ভিতর শব্দপ্রবাহের কলধ্বনি ও তার মাধুর্য অতি-আশ্চর্য-রকম মনোরমভাবে আছে। এটা আমরা বিদেশী হলেও বোধ হয় অনুভব করতে পারি। এটা হল কাব্যের গীতি-অংশের কথা।

শেলির আর-একটি দিক ছিল সেটি আমরা সকলেই উপলব্ধি করতে পারি। সে হচ্ছে কী, না, তিনি একজন মানুষ ছিলেন, তিনি সর্বাংশে কবি ছিলেন। অর্থাৎ ষোলো-আনা তাঁর সমস্ত জীবনটিকে তিনি কবিত্বে পরিণত করেছিলেন। তাঁর ব্যবহার তাঁর যা-কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা তার সমস্তই এক কবিত্বের ছাঁচে ঢেলে তৈরি করেছিলেন, এ কথা বেশ উপলব্ধি করা যায়। অনেক কবিকে জানি, এক-টা বিশেষ সময়ে হয়তো কবিত্বের ভূত তাঁদের পেয়ে বসলে পর কাব্য রচনা করেন এবং বেশ ভালো কাব্যও রচনা করেন। আমাদের বিক্রমাদিত্যের কথায় আছে যে, এক সিংহাসন ছিল সেই সিংহাসনে বসলে রাখালও রাজার মতন হয়ে উঠত, তেমনিতর ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃতির গোপন কোণে এক গুপ্ত সিংহাসন থাকতে পারে সেখানে বসলে পর অন্য চব্বিশ ঘণ্টার রাখাল ঘণ্টা-বিশেষের কবি হয়েও উঠতে পারে। কিন্তু শেলির জীবনের আশৈশব গতি এবং প্রকৃতি সমস্তই কবির। অর্থাৎ, imagination, যাকে বলে কল্পনা (ঠিক সে শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ আমি বলতে পারব না / হয়তো নেই), imaginationএর আবহাওয়ায় তাঁর মন নিমগ্ন ছিল— কেবল তাঁর মগজের এক অংশ নয়, তাঁর সমস্ত জীবন নিমগ্ন ছিল। এইজন্য তাঁকে

লোকে ক্ষেপা বলে মনে করেছে অনেক সময়। এইজন্য তাঁকে প্রবীণ বিচক্ষণ লোকে সংসারী লোকে হয়তো ঘৃণা করেছে এবং তাঁর প্রতি তাদের একটা বিদ্বেষবুদ্ধি জন্মেছে। ঐ জন্যই সেই ক্ষেপা চারি দিকের সঙ্গে খাপ খায় নি।

অন্যান্য সাধারণ বা অসাধারণ ব্যক্তির মতো শেলিরও কতকগুলি মতামত ছিল। এ কথা আমরা সকলেই জানি মতামত থাকাটা কবিত্বের পক্ষে একটা বালাই। সেগুলি এসে পড়ে কেমনতর, যেমন এক-একটি পাথরের টুকরো আসে ঝরনার মুখে। নিজেদের বড়ো করে দেখিয়ে মতামতগুলি খাড়া হয়ে ওঠে, ভ্রূকুটি করে দাঁড়ায়, এবং রসের ধারাকে প্রতিহত করে, এইটে সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায়। সেটা আমরা Wordsworthএ বিশেষ করে দেখেছি। যেখানে তিনি রসেতে খুব পূর্ণ হয়েছেন সেখানে তিনি মতকে চাপা দিতে পেরেছেন। কিন্তু সেই পূর্ণতার একটু খর্ব হবামাত্র তাঁর মতগুলো খাড়া হয়ে উঠে রসপ্রবাহের প্রতিবাদ করতে থাকে। শেলিরও মতামত ছিল স্বাধীনতা সম্বন্ধে, মানবজাতির জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে, ধর্ম সম্বন্ধে, রাজনীতি সম্বন্ধে। কিন্তু সেই মতগুলি পাগলামির দ্বারা বেশ মজে গিয়েছিল। সে ছিল এক পাগলা কবির মতামত। সুবুদ্ধি জিনিষটা মর্ত্যের জিনিষ কিন্তু উচ্চ অঙ্গের খাঁটি যে পাগলামি সে দৈবী। তাই বুঝি সুবুদ্ধির গড়া জিনিষ ভেঙে ভেঙে পড়ে আর পাগলামির উড়িয়ে-আনা জিনিষ বীজের মতো অরণ্যের পর অরণ্য সৃষ্টি করে। তাই পাগলা শেলির বাণী আজও নবীন আছে। তার মন্ত্রগুণ আজও নষ্ট হয় নি। তিনি যখন বালক তখন থেকেই রাজশক্তি সমাজশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করতে উদ্যত হয়েছিলেন সেটা যে কোনো-রকম হিসেবি বুদ্ধি থেকে তা নয়। উনপঞ্চাশ পবনের দ্বারা চালিত হয়ে যেন তিনি দৌড়ে ছুটেছিলেন। অত্যন্ত উদ্দাম হৃদয়ের imaginationএর বেগের দ্বারা উতলা হয়ে উঠে তিনি এত বড়ো মানবজাতির দূর ভবিষ্যৎকে মহিমামণ্ডিত করে দেখতে পেয়েছিলেন। মানবজাতির দূর ভবিষ্যৎগৌরবের সেই স্বর্গলোককে তিনি যে দেখতে পেয়েছিলেন, সেই আনন্দে মুগ্ধ হয়ে তিনি বর্তমান কালের যা-কিছু দুর্গতি তাকে অত্যন্ত আঘাত দেবার চেষ্টা করেছিলেন। ...[২] দুই সংঘবদ্ধ শক্তিকে তিনি আঘাত করেছেন তাঁর কাব্যের ভিতর দিয়ে। রাজতন্ত্র এবং পুরোহিততন্ত্র। তিনি বলেছেন, মানুষ এই দুই তন্ত্রের দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়ে একেবারে জর্জর হয়ে গেল; এক দিক থেকে বাইরে তাকে দাসত্বে বদ্ধ করেছে রাজশক্তি, আর-এক দিকে ধর্মতন্ত্র তার আত্মাকে সংকীর্ণ করেছে, মুগ্ধ করে রেখে দিয়েছে। এই দাসত্বের বন্ধন আর মোহের বন্ধন তিনি সইতে পারেন নি।

এ কথা স্বীকার করতে হবে যে Revolt of Islam প্রভৃতি যে-সব কাব্যে তিনি তাঁর এই মতগুলিকে উদ্যতভাবে প্রকাশ করেছেন, সেগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য নয়। অপর পক্ষে তাঁর এই মতই Prometheus Unboundএ সংগীতে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। আমরা তাঁর দূর দেশের লোক এবং দূর কালের কিন্তু আমরাও আজ তাঁকে বলতে পারি 'তোমার

কাছ থেকে মন্ত্র নেব'। আমরাও রাজশক্তিকে তার রুদ্ধ বেষ্টনের মধ্যে থেকে উদ্ধার করে জনসাধারণের মধ্যে বিকীর্ণ করতে চাই। যে শক্তি রাজদণ্ডরূপে আমাদের হাতে থাকবে সেটাকে আমাদের মেরুদণ্ডের উপর পড়তে দিতে পারি নে, এই কথা আমাদের বলবার সময় হয়েছে।

এখানে আমরা কবিকে বলব যে, তুমি আমাদের কবি, আমাদের কথাই তুমি বলেছ। ধর্মতন্ত্র আমাদের আত্মাকে বস্তুপ্রবণ বস্তুতন্ত্রের দ্বারা আবিষ্ট করে দিয়েছে, এ অত্যন্ত সত্য। আমরা যে-সব জড় বিশ্বাসকে অন্ধভাবে জড়িয়ে ধ'রে, জড় মন্ত্রকে না চিন্তা ক'রে কেবল আবৃত্তি ক'রে যাওয়ার ভিতরে ধর্মলাভ পুণ্যলাভ করতে চেষ্টা করেছি, তার দ্বারা কতখানি নিজেকে খর্ব করেছি সেটা বলা যায় না। এটা সেদিনও যেমন বিপদের কথা আজও সেইরকম বিপদের কথা। শেলি সেদিন এর প্রতিকার-চেষ্টায় যে বিপদে পড়ে-ছিলেন আজকার দিনেও সেই বিপদই রয়ে গেছে। বাহিরের ক্ষেত্রে এই শাসনশক্তি এবং অন্তরের ক্ষেত্রে এই অন্ধমোহের শক্তিকে আজও প্রতিরোধ করতে যে দাঁড়াবে বাহির থেকে তাকেও মার খেতে হবে এবং তাকেও তার আত্মীয়েরা বলবে, 'তুমি আমাদের আত্মীয় নও।' কিন্তু তবু বলতে হবে যে, এই দুই তন্ত্র থেকে আমাদের মুক্তিলাভ করবার দিন এসেছে। ইংরেজ কবি শেলি তাঁর জীবন দিয়ে তাঁর কবিতা দিয়ে এই কথাই সকল মানুষের হয়ে বলেছেন।

এইজন্যই আমি আজকে শেলিকে আমাদের এই সভাতে, আমাদের এই বাঙালির সভাতে, আদর করে ডাকছি। আমি এইজন্যই বলছি যে, 'তোমার বাণী আমাদের বাণী। তোমার কাব্যে পৃথিবীর সকল মানুষের কথা, বিশেষভাবে আমাদের এই কালের, আমাদের এই দেশের।' প্রবল বিদ্রোহ নিয়ে তিনি যে-সব প্রচণ্ড শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে তাদের দ্বারা পীড়িত হয়েছেন, তাড়িত হয়েছেন, সেই শক্তি আমাদের সমস্ত দেশকে ব্যাপ্ত করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার দুর্গ বাইরে নয়— মনে। সমস্ত দেশের সব জায়গায় সে তার ভিত্তি গেড়েছে— প্রত্যেকের হৃদয়ের ভিতরে, জীবনের ভিতরে। চূর্ণ করে ফেলতে হবে তার প্রভাব। এই-যে প্রচণ্ড শক্তি এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে, বিদ্রোহের ধ্বজা তুলতে হবে। কবির কাছ থেকে তার সম্মতি আসবে। এই বিদ্রোহের মন্ত্র কবির কাছ থেকে আমরা গ্রহণ করব। এইজন্য বলছি যে, 'আজিকার দিনে তোমাকে আমরা অভিবাদন করি, তোমাকে আমরা আহ্বান করি, আমাদের মনের মধ্যে আমাদের আপনাদের[৩] মধ্যে তুমি তোমার সিংহাসন গ্রহণ করো।'

আর-একটা কথা আছে। যখন শেলির কাব্য ভালো করে আলোচনা করা যায় তখন দেখি, এই বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরাত্মার সঙ্গে তিনি যেন কারবার করতে চেয়েছিলেন। তাঁর কাছে বিশ্বের বাইরের রূপ তেমন বেশি সত্য ছিল না। সেইজন্য আমরা দেখতে পাই যে, শেলির কাব্যে একের সঙ্গে আরের যে মিলে যাওয়া এ অতি সহজে হয়— একটা ভাবের সঙ্গে আর-একটা ভাবের, একটা রূপের সঙ্গে আর-একটা রূপের। বিশ্বে বাইরের যে রূপ,

যেটা স্থূল রূপ, সেটা যেন তাঁর[৪] কাছে ছিল না বললেই হয়। আপনারা তাঁর[৪] সেই skylarkএর কবিতাটা মনে মনে ভেবে দেখুন। skylark তো একটি পাখি নয়, সে বিশ্বসৌন্দর্যের একটি উৎস। ওই-যে পাখির গান, ওর সঙ্গে কবি এই জগতের বিচিত্র সৌন্দর্যের মর্মগত মূল সাদৃশ্য দেখেছিলেন।

বিচিত্রসুখদুঃখময় মানুষের এই জীবনটাকেও শেলি যেন একটা পর্দার মতো করে দেখেছিলেন। এর খণ্ডতা এর স্থূলতা যেন সত্যকে আবৃত করে রয়েছে। এই কুহেলিকার পর্দাখানা ছিঁড়ে ফেলে সত্যের অখণ্ড নির্মল মূর্তি দেখবার জন্যে কবির ভারী একটা ব্যাকুলতা ছিল। কতবার সেইজন্তে তিনি মৃত্যুর মধ্যে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করেছেন। এই মুক্তিপিপাসু কবি যেমন রাজতন্ত্র ও ধর্মতন্ত্রের বাধা সইতে পারেন নি, তেমনিই মানুষের জীবনের খণ্ড চেতনা বিরাট সত্যের উপলব্ধি থেকে আমাদের চিত্তকে যে গণ্ডিবদ্ধ করে রেখেছে এও তিনি সহ্য করতে পারেন নি। এইখানে যেন শেলির মনের সঙ্গে আমাদের ভারতীয় মনের একটা মিল দেখতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষও এই ব্যাবহারিক জগৎকে এই স্থূল জগৎকে সম্পূর্ণ সত্য বলে বিশ্বাস করে না এবং এর ভিতরে অন্তরতম অন্তর্যামী যে সত্য আছে তাকেই সন্ধান করে বেড়ায়। এই প্রসঙ্গে আর-একটা কথা বলবার আছে। শেলিকে তাঁর জীবনকালে ও পরবর্তীকালে তাঁর দেশের লোকে নাস্তিক বলে অপবাদ দিয়েছে। তার কারণ এই যে, প্রচলিত ধর্মতন্ত্র পুরোহিততন্ত্রকে তিনি আঘাত করেছেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে যে গভীর একটা ধর্মের তৃষ্ণা ছিল, একটা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ছিল, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ করা যেতে পারে না। তিনি তাঁর Alaster[৫] কাব্যের মধ্যে যে সন্ধানের বেদনা প্রকাশ করেছেন, সে কিসের সন্ধান? মেঘদূতে বিরহীযক্ষের হৃদয়ব্যথা যেমন প্রকৃতির সৌন্দর্যের বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে সেই সৌন্দর্যের চরমতাকে অলকাপুরীতে গিয়ে স্পর্শ করেছিল, এলাস্টরেও তেমনি মানুষের ব্যথা প্রকৃতির সৌন্দর্যের ভিতরে অমৃতের সন্ধান করে সেই প্রকৃতির-অতীত লোকে তাকে পাবার চেষ্টা করেছে। প্রকৃতির মধ্যে তার তৃপ্তির পূর্ণতা হয় নি। আত্মা যে আত্মীয়কেই চায়, বিশ্বের অলকাপুরীতে সেই আত্মীয় যদি কোথাও না থাকে, সমস্তই যদি কেবল আধিভৌতিক হয়, তা হলে তো বিরহের আর অন্ত নেই। আত্মার আত্মিক সম্বন্ধ বিশ্বে যদি না থাকে, তা হলে তো এ কারাগার। এই-যে আত্মিক সম্বন্ধ এর একটি পরমাশ্রয় এর কোনো-একটা অপরূপ প্রকাশ কোথায় আছে? এই খুঁজতে সে বেরুল। যখন প্রকৃতির সৌন্দর্য আর তাকে তৃপ্তি দান করলে না তখন সে কেবল বলতে লাগল— কোথায় পাব! কোথায় পাব! মাঝে মাঝে এই সন্ধানী কোনো-এক সুন্দরীর কল্পমূর্তি দেখেছে। বিশ্বের অন্তরতম আনন্দ যেন বাহিরে রূপধারণ ক'রে তার মনের সামনে সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার মধ্যে সে তৃপ্তি লাভ করতে গিয়ে সেগুলি স্বপ্নের মতন যখন তিরোহিত হয়েছে তখন সে নৈরাশ্যে

২ চিহ্নিট ভারতী-ধৃত ৩ আনন্দের? ৪ তাঁর/ভারতী ৫ Alastor

অভিভূত হয়ে রয়েছে। কিন্তু তার যে বেদনা, সেই-যে সন্ধান, তারই দ্বারা প্রমাণ হয় যে, পরমসৌন্দর্যময় একটি আত্মিক সত্তা বিশ্বের মধ্যে আছে। সে সম্বন্ধে শেলির চিত্তে গভীর-বেদনা-পূর্ণ একটি আকৃতি ছিল। এইজন্যই তিনি Alastor[৫]'এর গোড়াতেই যে উদ্‌বোধন লিখেছেন সে তো নাস্তিকের লেখা নয়। তিনি গেয়েছেন: 'হে পৃথিবী, হে মহাসমুদ্র, হে আকাশ, হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃমণ্ডলী, যদি আমার সেই মহামাতা আমার এই আত্মাকে এমন ধর্মসম্বন্ধের বন্ধনে বেঁধে থাকেন যাতে করে আমি অনুভব করতে পেরে থাকি তোমাদের প্রীতি আর তার প্রতিদানে আমারও প্রীতি দিয়ে থাকি; যদি আমার কাছে প্রিয় হয়ে থাকে শিশিরস্নিগ্ধ প্রভাত, পুষ্পগন্ধে আবিষ্ট মধ্যাহ্ন, সূর্যাস্তের কিরণমহিমায় মহোজ্জ্বল সন্ধ্যা, গম্ভীর অর্ধরাত্রের রোমাঞ্চকর নিঃশব্দতা, শরৎকালের রিক্তপত্র-অরণ্য-সঞ্চারী দীর্ঘনিশ্বাস, নির্মল-তুষারবিন্দু-খচিত তৃণ ও নিষ্পত্র শাখার দ্বারা মুকুটিত শীত, নব-বসন্তের প্রথম চুম্বনবৃষ্টি, তার বাসনা-আবেশের ঘন নিশ্বাসবেগ; যদি কোনো সুন্দর পাখি বা পতঙ্গ কিম্বা কোনো নিরীহ জন্তুকে আমি ইচ্ছাপূর্বক আঘাত করে না থাকি আর যদি তাদের আমার আত্মীয় বলেই ভালোবেসে থাকি; তবে ক্ষমা করো আমার এই অহংকার-উক্তি, তবে আমার কাছ থেকে তোমার দয়ার এক কণাও ফিরিয়ে নিয়ো না। হে অতলস্পর্শ-বিশ্বসমুদ্র-শায়িনী মাতা, তুমি আমার এই গম্ভীর গানের প্রতি প্রসাদ বর্ষণ করো, কেননা চিরদিন আমি তোমাকে ভালোবেসেছি, একমাত্র তোমাকেই আমি ভালোবেসেছি। আমি তোমার পদক্ষেপের ছায়ার দিকেই এতদিন তাকিয়ে আছি আর আমার হৃদয়ের দৃষ্টি চিরকাল তোমার গহন রহস্যের গভীরতার মধ্যেই নিবিষ্ট হয়ে আছে। যেখানে কৃষ্ণবর্ণ মৃত্যু তোমার ভাণ্ডার থেকে লুট করা তার জয়লব্ধ ধনের বৃত্তান্ত লিখে রাখে সেই শ্মশানে শবের শয্যায় আমার আসন পেতেছি, আশা করেছি তোমার কোনো নির্জনবিহারী দূতের কাছ থেকে প্রেতের কাছ থেকে তুমি কে জোর ক'রে জেনে নেব— আমার মনের অশান্ত জিজ্ঞাসাকে শান্ত করব। যেমন কোনো ভাবোদ্দীপ্ত আল্‌কিমি-বিদ্যার সাধক গূঢ় সিদ্ধির আশায় মরিয়া হয়ে আপনার প্রাণ পর্যন্ত পণ ক'রে বসে, আমি তেমনি উদ্দাম আকাঙ্ক্ষায় ঝিল্লিঝঙ্কৃত রাত্রির নির্জন নিস্তব্ধ প্রহরে অশ্রুতে চুম্বনে গম্ভীরবাণীতে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে মিশিয়ে এমন একটি জাদু রচনা করেছি যার শক্তিতে মন্ত্রমুগ্ধ রাত্রির কাছে থেকে তোমার রহস্য ভুলিয়ে নিতে পারি। যদিও তোমার অন্তরতম মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে পারলেম না কিন্তু এই-যে অনির্বচনীয় সমস্ত স্বপ্নধারা, এই-যে প্রদোষকালের ছায়ামূর্তি, নিশীথকালের গভীর চিন্তালহরী, এরা আমার মনের ভিতর দীপ্যমান হয়ে উঠেছে; সেইজন্যই আমি কোনো একটি পরিত্যক্ত মন্দিরের রহস্যময় নির্জন মণ্ডপে লম্বমান দীর্ঘকাল-বিস্মৃত বীণার মতো প্রশান্ত এবং নিশ্চল হয়ে, হে মাতা, আমার মধ্যে তোমার নিশ্বাসপাতের জন্যে অপেক্ষা করছি— সেই নিশ্বাস যার প্রভাবে আমার গানের তান বাতাসের ধ্বনিতে, অরণ্য ও সমুদ্রের নৃত্যে, দিন ও রাত্রির দ্বারা উদ্গীত স্তবগানে এবং মানবের গভীর হৃদয়-

বেদনার মূর্ছনায় মিলিত হয়ে রচিত হয়ে ওঠে।' —এ কি নাস্তিকের কথা?

এলাস্টরে কবি কেবল সন্ধানের কথা বলেছেন; এই সন্ধান অবশেষে যে উপলব্ধিতে এসে পৌঁচেছে সেই উপলব্ধির গান হচ্ছে তাঁর Hymn to Intellectual Beauty। সেইটি পাঠ করে আজ সভাভঙ্গ করি।—

'একটি অদৃশ্য শক্তির বিরাট ছায়া আমাদের মধ্যে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে— তাকে আমরা জানি নে, দেখতে পাই নে। এই বিচিত্র জগৎকে সে তার চঞ্চল পক্ষ দ্বারা স্পর্শ ক'রে ক'রে যাচ্ছে কেমনতর? না, যেমনতর বসন্তের বাতাস পুষ্প থেকে পুষ্পান্তরে ধীরে ধীরে চলে যায়, যেমনতর পর্বতের দেবদারুদ্রুমচ্ছায়ার-অন্তরাল-বর্তী নির্ঝরধারার উপর জ্যোৎস্নালোক পড়ে, তেমনি করে প্রত্যেক মানবের হৃদয় এবং মুখশ্রীকে ক্ষণে ক্ষণে তার সেই চঞ্চল কটাক্ষপাতের দ্বারা স্পর্শ করে যাচ্ছে। সন্ধ্যাবেলাকার সংগীত এবং বর্ণচ্ছটার সম্মিলনীর মতো, নক্ষত্র-আলোকে উদারবিস্তৃত মেঘমালার মতো, যে সংগীত শান্ত হয়ে গিয়েছে তারই স্মৃতির মতো, এমন যা-কিছু আছে যা তার সৌন্দর্যের জন্যই আমাদের কাছে প্রিয় কিন্তু তার চেয়ে প্রিয়তর তার অনির্বচনীয়তার জন্য— সেই-সমস্তের মতো একটি অদৃশ্য শক্তির ছায়া আমাদের মধ্যে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। হে সৌন্দর্যলক্ষ্মী, মানুষের দেহমনের উপরে যখন তোমার বর্ণরশ্মি পড়ে তখন তারা পবিত্র হয়ে যায়; তোমাকে আজ আমি জিজ্ঞাসা করি তুমি কোথায় চলে গিয়েছ? কেন বা তুমি এমন করে চলে চলে যাও? কেন বা তুমি আমাদের জীবনকে এমন অশ্রুসিক্ত কুহেলিকাবৃত করে তোল— তাকে বিষাদে পূর্ণ করে দিয়ে চলে যাও? কিন্তু এই যদি আমার জিজ্ঞাসা হয় তবে এও প্রশ্ন করতে হয় যে, পর্বতের উপর দিয়ে যে ঝর্না পড়ছে তার উপরে সূর্যের আলো চিরদিনই ইন্দ্রধনু ফোটায় না কেন? কেন যা এক সময় দেখা যায় আর-এক সময় তা শুকিয়ে যায় ঝরে যায়? কেন আশা আকাঙ্ক্ষা জন্ম এবং মৃত্যু পৃথিবীর এই দিবালোকের উপরে এমন অন্ধকার বিস্তার করেছে? কেন একই মানুষের ভিতরে ভালোবাসবার এবং বিদ্বেষ করবার আবেগ, নৈরাশ্যের নিষ্ফলতা এবং আশার শক্তি এক সঙ্গে ঘটে? এর তো কোনো উত্তর পাই না। ঊর্ধ্বলোক থেকে কোনো তপস্বী কোনো কবি এ প্রশ্নের উত্তর দেয় নি। সেইজন্য মানুষ, দৈত্য দানব প্রেত স্বর্গ প্রভৃতি কতকগুলি নাম নিয়ে আপনাকে ভুলিয়েছে; সেই নামগুলি আমাদের ব্যর্থ প্রয়াসের ইতিহাস-রূপে রয়ে গেছে। এই-সমস্ত নামের নিষ্ফল মায়ামন্ত্র তো আমাদের উদ্ধার করতে পারে না; আমরা এই-সব যা-কিছু দেখছি শুনছি তার ভিতরকার সংশয় আকস্মিকতা পরিবর্তনশীলতার হাত থেকে আমাদের ত্রাণ করতে পারে না। কেবলমাত্র তোমার দিব্যজ্যোতি গিরিশৃঙ্গের উপর দিয়ে ধাবমান কুহেলিকার মতো, কোনো নিস্তব্ধ বীণাযন্ত্রের তারগুলির মধ্যে নিশীথবায়ুর স্পর্শঘাতে জাগরিত সংগীতের মতো, মধ্যরাত্রে স্রোতস্বিনীর জলধারার উপর জ্যোৎস্নালোকের মতো মানবজীবনের অশান্ত দুঃস্বপ্নে সৌন্দর্য এবং সত্য বিকীর্ণ করে। ভালোবাসা আশা

আত্মসম্মান এ-সব মেঘের মতন যায় এবং আসে। ক্ষণকালের ধার-করা জিনিষের মতন তাদের কখন পাই কখন হারাই। কিন্তু মানুষ যে সর্বশক্তিমান হ'ত, দেবতা হ'ত, যদি তুমি, হে অপরিমেয়, হে বিরাট, তোমার নিজের প্রভাবকে তার হৃদয়ের মধ্যে চিরন্তন করে রাখতে। তোমার প্রেমের দৌত্য প্রেমিকদের চোখে চোখে চাওয়ার উপরে কখনো উজ্জ্বল কখনো ম্লান হচ্ছে, তুমি যে মানুষের চিত্তকে তার খাদ্য জোগাচ্ছ— যেয়ো না তুমি যেয়ো না, ছায়া যেমন এসে চলে যায় তেমনি ক'রে তুমি যেয়ো না। যদি তুমি যাও তা হলে মৃত্যুর মধ্যেও যে আমাদের আশা করবার কিছু থাকবে না, সেও যে জীবনের মতোই অন্ধকারময় ভীষণ হয়ে উঠবে। যখন আমি এক সময় বালক ছিলেম তখন আমি ভূত প্রেতদের খুঁজে বেড়িয়েছি। কত সব নির্জন ঘরের কান-পাতা নিঃশব্দতার ভিতর দিয়ে— কত গুহা কত পুরাতন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ কত তারালোকিত বনভূমির ভিতর দিয়ে আমি ভয়ে ভয়ে পা ফেলে গিয়েছি— মনে আশা রেখেছি যে, যারা যারা পরলোকে গিয়েছে তাদের কাছ থেকে কোনো-একটি বার্তা পাব। আমার বাল্যকালে যে-সমস্ত বিষাক্ত নাম, দেবদৈত্যের যে-সমস্ত নাম জানতেম সেই-সমস্ত নাম ধরে কতবার ডেকেছি— আমায় কেউ উত্তর দেয় নি। একদিন কিন্তু যখন এই জীবনের রহস্যের কথা গভীরভাবে নিবিষ্ট হয়ে ভাবছি— সে সময়টি কেমন? না, যখন মধুর মধুমাসে দক্ষিণ সমীরণের সাধনাগুণে জীবলোকে পাখির গান আর পুষ্পমঞ্জরীর বিকাশের ঘোষণা ছড়িয়ে গেছে— সেই সময়ে হঠাৎ তোমার ছায়া আমার উপরে অবতীর্ণ হল। পরমানন্দে দুই হাত জোড় করে চীৎকার করে উঠলেম। আমি এই প্রতিজ্ঞা করলেম যে, তোমাকে— আমার যা-কিছু আছে সব তোমাকে উৎসর্গ করব। সে প্রতিজ্ঞা আমি কি রাখি নি? আমার এই হৃদয় স্পন্দিত হচ্ছে, আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। এই এখনি আমি তাদের ডাকছি, অতীতকালের সেই জ্বলন্ত প্রহরগুলিকে সাক্ষী ডাকছি, তারা আমার সঙ্গে কতদিন রাত জেগেছে, সেই-সব রাত যা কখনো অধ্যয়নের আগ্রহে কখনো প্রেমের আনন্দে কেটে গেছে। সেই আমার সাক্ষীরা জানে, যে, যখনই আনন্দের আভায় আমার ললাট উদ্দীপ্ত হয়েছে তখনই সেই সঙ্গে এই আশা আমার মনে জেগেছে যে, তুমি এই জগৎকে তার দাসত্বের তামস থেকে মুক্ত করে দেবে— তুমি, হে বিরাট মাধুরী, আমাদের এমন কিছু দেবে যা আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারি নে।'

—ভারতী। আশ্বিন ১৩২৯। পৃ ৫২৩-৩১

শেলি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

কলকাতা

২০ মার্চ [১৮৯৫ । ৭ চৈত্র ১৩০১]

শেলিকে অন্যান্য অনেক বড়োলোকের চেয়ে বিশেষরূপে কেন ভালো লাগে জানিস? ওর চরিত্রে কোনো রকম দ্বিধা ছিল না, ও কখনো আপনাকে কিম্বা আর-কাউকে বিশ্লেষণ করে দেখে নি— ওর এক রকম অখণ্ড প্রকৃতি। শিশুদের, এবং অনেক স্থলে মেয়েদের, এইজন্যে বিশেষ রূপে ভালো লাগে— তারা সহজ, স্বাভাবিক, তারা নিজের মনের বিতর্ক কিম্বা থিয়োরি-দ্বারা নিজেকে ভেঙেচুরে গড়ে নি। শেলির স্বভাবের যে সৌন্দর্য তার মধ্যে তর্ক বিতর্ক আলোচনার লেশ নেই। সে যা হয়েছে, সে কেবল নিজের ভিতরকার এক অনিবার্য সৃজনশক্তির প্রভাবেই হয়েছে। সে নিজের জন্যে নিজে কিছুমাত্র দায়ী নয়— সে জানেও না সে কাকে কখন্ আঘাত দিচ্ছে, কাকে কখন্ সুখী করছে— তাকেও কোনো বিষয়ে নিশ্চয়রূপে কারও জানবার যো নেই। কেবল এইটুকু স্থির যে, ও যা ও তাই, তা ছাড়া ওর আর-কিছু হবার যো ছিল না। ও বাইরের প্রকৃতির মতো স্বভাবতই উদার এবং সুন্দর এবং স্বভাবতই নিজের এবং পরের সম্বন্ধে চিন্তা ও দ্বিধা মাত্র -হীন। এই রকম অখণ্ড প্রকৃতির লোকের ভারী একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। এদের সকলেই মাপ করে এবং মায়া করে— কোনো দোষ এদের স্বভাবে যেন স্থায়ীভাবে লিপ্ত হতে পারে না। এদের স্বভাব প্রথম যুগের আদম ইভের মতো আবরণহীন এবং সেইজন্যেই এক হিসাবে পরমরহস্যময়। এরা এখনো জ্ঞানবৃক্ষের ফল খায় নি ব'লে ,একটি নিত্য সত্যযুগে বাস করছে। যারা চিন্তা করে, আলোচনা করে, যারা বিবেচনা করে, যারা জানে ভালোমন্দ কাকে বলে, তাদের সহজে ভালোবাসা ভারী শক্ত। তারা শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস পেতে পারে, কিন্তু তারা অনায়াস ভালোবাসা পায় না। তারা আত্মবিসর্জন করতে পারে, কিন্তু তারা আত্মবিসর্জন আকর্ষণ করতে পারে না।… মানুষের মন-নামক পদার্থটি শ্রদ্ধার যোগ্য, কিন্তু ভালোবাসার পাত্র নয়— আসল খাঁটি বড়োলোকেরা মনোবিহীন, তারা স্বতঃস্ফূর্তিবিশিষ্ট, তারা বিনা চেষ্টায় বিনা যুক্তিতে অনিবার্যবলে লোককে আকর্ষণ করে নেয়॥

—ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ২০৪

বলাকা'য়
ছন্দোবিবর্তন

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বহুখ্যাত ও বহুপঠিত গ্রন্থগুলির মধ্যে রথীন্দ্রনাথের 'পিতৃস্মৃতি' (১৩৭৩। সংস্করণ ১৩৭৮) অন্যতম। মূল ইংরেজিতে (*On the Edges of Time*, 1958) নাই, এমন কোনো কোনো বিষয় বাংলা গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। এই সংযোজনের মধ্যে রথীন্দ্রনাথের বিরল কয়েকখানি ডায়ারির পাতাও আছে। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ বা ২ ফাল্গুন ১৩২১ তারিখে রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন রচনা সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য দেওয়া হইয়াছে যাহা রবীন্দ্র-কাব্যভাবুক বা ছন্দোজিজ্ঞাসু কাহারও অনবধানের অথবা উপেক্ষার বিষয় নয়। প্রাসঙ্গিক রচনাংশ মূল ডায়ারি হইতে এখানে সংকলন করা যাইতেছে (বানান ও বিরামচিহ্ন আধুনিক বটে) :

বাবা পরশুদিন শিলাইদহ থেকে ফিরে এসেছেন। ·· অনেকগুলো কবিতা ও একটা গল্প [চতুরঙ্গ-ভুক্ত 'শ্রীবিলাস'] এই ক'টা দিনের মধ্যে লিখে ফেলেছেন। গল্প শোনবার জন্যে মণিলাল [গঙ্গোপাধ্যায়] সকলকে খবর দিয়েছিল·· প্রথমে তাঁর নতুন কবিতাগুলো পড়তে লাগলেন। বললেন কিছুদিন আগে রমণীমোহন ঘোষ[১] তাঁকে কথায় কথায় বলেছিলেন যে

১ ইনি কবির অনুরাগী, নিজেও কবিতা লিখিতেন তাহা সেকালের পত্র-পত্রিকায় চোখে পড়িবে। রবীন্দ্রকাব্যে ইঁহার প্রীতি এবং অভিনিবেশ নানা প্রবন্ধ আকারেও প্রচারিত হইয়া থাকিবে, তাহারই বিশেষ নিদর্শন ১৩০৬ আষাঢ়ের প্রদীপে 'চৈতালি' নামে মুদ্রিত ও কিছু-কাল পূর্বে (১৩৬৯) শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় -সম্পাদিত রবীন্দ্রসাগরসংগমে গ্রন্থে সংকলিত। রবীন্দ্রসম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে লেখা ইঁহার 'কবি-অভিষেক' প্রবন্ধ ১৩১৮ ফাল্গুনের বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত। ইঁহারই উদ্দেশে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা 'বন্ধুর চিঠি' শিরোনামে রবি-প্রয়াণের পর (১৩৪৮) 'সম্প্রতি' বার্ষিক সংকলনে (১৩৪৯) প্রকাশিত হয় :

হে বন্ধু, এই অকিঞ্চনের ঘরে
কখনো যে আসো শুধু ক্ষণেকের তরে
সমাদরে কিছু করি যে সমর্পণ
ঘরে তো আমার নাই হেন আয়োজন।
আমি ছুটি যবে উপহার আনিবারে
তুমি চলে যাও কথাটি না বলি কারে।
সন্ধ্যাবেলায় দেখি ঘরে ফিরে এসে
তোমার যা দান দিয়ে গেছ নিঃশেষে।

আপনাকে তো আজকাল আবার সেই সা ধু ভা ষা য় ফিরে যেতে হল— সেটার তখন কিছু প্রতিবাদ করেন নি— কিন্তু মনে মনে ছিল যে এখন যে ন তু ন ছ ন্দ ব্যবহার করছেন তাতে স হ জ বাং লা ভা ষা য় লিখতে চেষ্টা করবেন। এবার শিলাইদায় গিয়ে 'মুক্তি' কবিতা সেই প্রথম চেষ্টা। প্রথমটায় একটু শক্ত ঠেকেছিল কিন্তু একবার একটা করতে তার পর সহজেই আসতে লাগল। বরঞ্চ দেখলেন এই রকম ভাঙা ছন্দে স হ জ ভা ষা ই ঠিক খাটে।… ইচ্ছা করে কোথাও কোথাও দু একটা অ ক্ষ র[২] কম দিয়েছেন— যাতে একটা লাইনের ঝোঁকটা আর একটা লাইনের উপর গিয়ে পড়ে, থেমে না যায়।

নতুন যা কবিতা জমেছে তাতে একটা বই হবার মতো হয়েছে।[৩]

—পিতৃস্মৃতি (১৩৭৩, পৃ. ২৮১-৮৩। '৭৮, পৃ. ২৭৯-৮১)

পিতৃস্মৃতি গ্রন্থে রথীন্দ্রনাথের ডায়ারির এই উৎকলনে 'পলাতকা…' এই শিরোনামটুকু যোগ না করিলেই ভালো হইত। চতুরঙ্গের 'শ্রীবিলাস' অংশের উল্লেখ কিছু পরে রথীন্দ্রনাথ নিজেই করিয়াছেন কিন্তু 'মুক্তি' কোন্ কাব্যের কোন্ কবিতা সেটি একটু বিচার বিবেচনা বা সন্ধান -সাপেক্ষ। ১৩২১ ফাল্গুনের মধ্যে, ১৩২৫ সনে সাময়িক পত্রে প্রচারিত (বৈশাখ-আশ্বিন) পলাতকার কোনো আখ্যান-কবিতাই লেখা হয় নাই, উক্ত কাব্যের কোনো রচনার কোনো তারিখ জানা না থাকিলেও ইহা হয়তো অনুমান করা চলে। পক্ষান্তরে বলাকার ২২-সংখ্যক কবিতাটি মুক্তি নামে প্রবাসী পত্রে সদ্য প্রচারিত হইয়া হয়তো তখন অনেকের হাতেও আসিয়াছে। আর, ইহাতেও কোনো ভুল নাই, যে প্রবহমান ভাঙা মহাপয়ার তথা মিশ্র-কলাবৃত্তের সমিল মুক্তক লইয়া বলাকা কাব্যের বিশেষ খ্যাতি, যাহার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব বলাকার ৬-সংখ্যক 'ছবি' কবিতায় 'তুমি কি. কেবল ছবি শুধু পটে লিখা'[৪]

২ 'অক্ষর' বলিতে ছন্দের মাত্রা বা unit, এ ক্ষেত্রে 'দল', এরূপ মনে করা চলে। ছড়ার ছন্দের উপযোগী পর্ব পূরণ করা হয় নাই সব ছত্রে, এজন্য আবৃত্তির আবেগ ছত্র হইতে ছত্রান্তরে স্বতই ধাবিত হয়, রচনার এই 'প্রবহমানতা' গুণের বিশেষ উল্লেখ করা হইয়াছে সংকলনের এই উনশেষ বাক্যে।

৩ মূলতঃ এই বাক্যটি পূর্ব অনুচ্ছেদের অঙ্গীভূত। ডায়ারিতে অল্প পরেই ভাবী কাব্যগ্রন্থের সম্ভবপর নাম লইয়া নানা জনের নানা জল্পনা-কল্পনার বিষয় জানা যায় : শৈবাল, স্রোতের শেওলি (দ্রষ্টব্য ১৫ সংখ্যা : মোর গান এরা সব শৈবালের দল ইত্যাদি), ঝরনা এবং পাগলঝোরা। এগুলির কোনোটি গ্রহণ করা হয় নাই, পরে 'বলাকা' (৩৬) কবিতাটি লেখা হয় এবং কাব্যেরও সার্থক নামকরণ হয় সেইরূপ —ইহা আজ কাহারও অবিদিত নাই।

৪ পূর্বপাঠ : ওগো ছবি, / তুমি কি কেবল এই ছবি ইত্যাদি। প্রচল বলাকা কাব্যে (নূতন সংস্করণ পৌষ ১৩৭৭) লিপিচিত্র দ্রষ্টব্য।

ইত্যাদি ছত্রে, তাহারই অর্থাৎ সেই ছন্দোরীতিরই নূতনতম বিবর্তন বা পুনশ্চ 'বন্ধনমুক্তি' এই 'মুক্তি'তে : যখন আমার হাতে ধ'রে

আদর করে

ডাকলে তুমি আপন পাশে

ইত্যাদি। এ ছন্দের প্রবাহ থামে নাই বা বাক্য শেষ হয় নাই, ৯টি ছত্রে একটি স্তবক সম্পূর্ণ হওয়ার আগে। ছন্দোবিদ্ ইহাকে বলিবেন সমিল দলবৃত্ত মুক্তক। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী 'দল' বলিতে সিলেব্‌ল্ (syllable), শব্দের বা পদের ন্যূনতম সেই অংশ যাহার কম এক কালে উচ্চারণ করা যায় না।

সুখের বিষয়, বলাকার সব কবিতাই রচনার কালক্রমে গ্রন্থে সন্নিবেশিত। প্রচল গ্রন্থে পূর্বপ্রচারিত-শিরোনাম-সহ সাময়িক পত্রে প্রথম প্রচারের বিস্তারিত সূচী দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে দেখা যাইবে, নিরন্তবেগবান ছন্দের প্রবাহে নূতন যে ঢেউ উঠিয়াছিল বাংলা ১৩২১ সনে ৩রা কার্তিকের এক রাত্রিকালে, প্রয়াগে গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে (৬), তাহা মিলাইতে না মিলাইতে ঠিক তাহারই পাশাপাশি আর-একটি নূতনতর ঢেউ দেখা দিল কবির চিরপ্রিয় পদ্মাতীরে, শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে (২২), সেও নির্জন ছাদে বা তারাখচিত নিশীথে নয় কি?

বলাকার 'মুক্তি' (২২) কবিতায় প্রবহমান মুক্তকের এই-যে নূতন মুক্তগতি, পলাতকার আখ্যান-কবিতায় উত্তীর্ণ হওয়ার আগে, বলাকায় তাহারই ধারাবাহী অন্যান্য কবিতার সংখ্যা ২৪, ২৬, ২৭, ২৯, ৩১-৩৩। ১৩২১ সনের মাঘেই (তা° ১৯-২৭। সংখ্যা ২২-৩৩) প্রায় পালা করিয়া একবার দলবৃত্ত আর একবার মিশ্রকলাবৃত্তের ব্যবহার হয় মুক্তক-রচনায়— শেষ দিকে দলবৃত্তেই যেন ঝোঁক বেশি। অথচ অন্তর্বর্তীকালে ২৩ সংখ্যায় এবং পরে ৩৬, ৩৭, ৪০-৪২ ও ৪৫ সংখ্যায় মুক্তক হইলেও মিশ্র কলাবৃত্তের উপযোগিতা কবিতার বিষয় গৌরব এবং / অথবা বিশেষ মেজাজের জন্যই, এটি লক্ষ্য করিতে হয়— তখন রমণীমোহনের উক্তির অর্থও বুঝা যায়।

এ কথা বলা বাহুল্য হইবে না যে, সংজ্ঞা স্থির করিয়া বা সংজ্ঞার্থ বিচার করিয়া রথীন্দ্রনাথ যেমন প্রসঙ্গের অবতারণা করেন নাই, স্বয়ং কবিরও সে সময়ে ঐরূপ কোনো প্রয়াস ছিল না। অনেক কথাই আমাদের ইঙ্গিতে ইশারায় ও সমুপস্থিত বিষয়ের প্রত্যক্ষ পরিচয় হইতে বুঝিয়া লইতে হইবে। সে হিসাবে দেখিতে পাই, রবীন্দ্রনাথ মিশ্রকলাবৃত্তে অমিল মুক্তক লিখিয়াছেন ১৩ অগ্রহায়ণ ১২৯৪ তারিখে; 'নিষ্ফল কামনা' নামে মানসী কাব্যে সেটি সংকলিত : বৃথা এ ক্রন্দন। / বৃথা এ অনল ভরা দুরন্ত বাসনা। / মিশ্রকলাবৃত্তেই সমিল মুক্তক লিখিলেন প্রায় ২৭ বৎসর পরে বলাকার পূর্বোক্ত 'ছবি' কবিতায়। কবিভক্ত রমণীমোহন ঘোষ একটু খোঁটা দেওয়ায় দলবৃত্তে সমিল মুক্তকও লেখা হইল অতি অল্পকাল পরে হেমন্তের পর শীত অতিক্রান্ত না হইতেই। ডায়ারির উৎকলনে কয়েকটি পদ বা পদগোষ্ঠীতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে

বিশ্লিষ্টভাবে সাজাইয়া। আমাদের বিবেচনায় সেগুলির তাৎপর্য এরূপ—

'সাধুভাষা' বলিতে, অভিজাত মিশ্রকলাবৃত্ত রীতি ও তদুপযোগী তৎসম শব্দ-প্রয়োগ।

'নতুন ছন্দ' বলিতে এ স্থলে সমিল মুক্তক।

অতঃপর 'সহজ বাংলা ভাষা' বলিয়া 'ছড়ার ছন্দ' বা 'সহজ ছন্দ' যে দলবৃত্ত, তাহারই উল্লেখ। এ ছন্দে গুরুগম্ভীর তৎসম শব্দ ও যুগ্মধ্বনি ('যুক্তাক্ষর') তেমন ব্যবহৃত হয় না, রবীন্দ্রকাব্যের বেলা এরূপ বলা না গেলেও কথ্য বাংলায় অজস্র শব্দ, ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম, প্রয়োগ করা যায় অবাধে— এ কারণেও ইহাকে 'সহজ বাংলা' বলা চলে।

'সাধুভাষায় ফিরে যাওয়া' বলিতে সাধু ছন্দে প্রত্যাবর্তন; যে ছড়ার ছন্দে ক্ষণিকা খেয়ার অজস্র রসোত্তীর্ণ কবিতার রচনা, সেটিতে নয়। উহা গান এবং ছোটো ছোটো লিরিকের উপযোগী যদি বা হয়, বিষয়গৌরবের অনুরোধে ছন্দেও গৌরব এবং গাম্ভীর্য না আনিলে চলে কি? সে যেমন মিশ্রকলাবৃত্ত পয়ারে মহাপয়ারে সম্ভব, সেই ছন্দ ভাঙিয়া মুক্তকেও সম্ভবপর তাহা মানিলাম, কিন্তু ছড়ার ছন্দে বা দলবৃত্তে কেমন করিয়া হয়? সে ক্ষেত্রে মুক্তকের মুক্তগতি, যেটি বলাকার বৈশিষ্ট্য, সেটির কোনো সম্ভাবনা কল্পনাও করা যায় নাই। কিন্তু কল্পনাতীত প্রত্যাশাতীত যেটি তাহারই আবাহন হয়তো মহাকবির কাজ। তাই দলবৃত্ত সমিল মুক্তক-উদ্ভাবনে বিলম্ব হইল না; তাহার অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি ও সিদ্ধি দেখা গেল পলাতকা কাব্যের অধিকাংশ কবিতায়। মুক্তক নয় অথচ প্রবহমান ও পংক্তিলঙ্ঘক, দলবৃত্তে এমন একটি কবিতাও লিখিলেন এই সময়ে— যেটির স্থান পলাতকায় উনশেষ কবিতা-রূপে এবং পূরবী কাব্যের প্রথমে। এই ছন্দোবন্ধের সার্থকতা কত দূর যাইতে পারে, রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ ও পরীক্ষার দ্বারা তাহা আমাদের দেখান নাই। না দেখানোই হয়তো ভালো, ভাবী কালের পথ উন্মুক্ত আছে।

পরিশেষে আর-একটা কথা বলা যায়। পলাতকার রসজ্ঞ পাঠক অবশ্যই মনে করিবেন, এত বিচিত্র ভাব ভাষার তরঙ্গ তুলিয়া এমন দ্রুত গল্প বলিতে হইলে, কবির পক্ষে / কবিতার পক্ষে এই দলবৃত্ত সমিল মুক্তকের অপেক্ষা আর কোনো স্বচ্ছন্দ সুন্দর ছন্দ হইতেই পারে না। এ দিকে বাংলা ছন্দের যেন ইহাই পরিসীমা। কবি কি তাহা স্বীকার করেন? তাহা হইলে আখ্যানকথনের অনুরোধে স্পন্দমান গদ্যের ফল্গুছন্দের ব্যবহার কেন করিবেন বারংবার পুনশ্চ শেষসপ্তক পত্রপুট ও শ্যামলীতে? গল্প বলিবার আবেগে ও আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ কত বিচিত্র ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন— গল্পের বিষয় বক্তব্য ও ব্যঞ্জনার বিকাশে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভার ক্রমপরিণতির হাত ধরিয়া তাহার বিবর্তন কোন্ দিকে এবং কতদূর— হয়তো ইহার সর্বাঙ্গীণ আলোচনা আজও করা হয় যাই।[৫]

---

৫ বর্তমান আলোচনায় মোটের উপর শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের ছন্দপরিক্রমায় (১৯৬৫) উত্থাপিত ও ব্যাখ্যাত ছন্দ-পরিভাষা ব্যবহৃত। প্রথম টীকায় সংকলিত কবিতাটি সংকলন করিয়া দেন শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি ৯এ

বহিরঙ্গ-বিবরণ

জাপানি খাতা, জাপানি ধরণে সেলাই, হাল্কা বাদামি রঙে পুরু কাগজের মলাট। বাহির-সারা মাপ ২৩·৮×১৬·৩×১·৩ সেন্টিমিটার। খাতার সামনে বিশেষভাবে নীচের দিক ও পিছনে বুক-পিঠ কিছুটা নষ্ট হইয়াছে বা পোকায় খাইয়াছে। প্রথম মলাটের ভিতর-পিঠে কবি যে ছবি আঁকেন তাহার বিশেষ ক্ষতি হয় নাই বা লেখাতেও পোকা ধরে নাই।

কবির লেখা যে দিকে তাহার উল্টা দিকে ৬ খানি পাতায় কোনো শিল্প- শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থিনী নানা ফুলের আকার অবয়ব আঁকিয়াছেন পেন্সিলে বা রঙে (পাতা ১, ২. ৬'এর এক পিঠে / বাকি দুই পিঠে) আর এ দিকে প্রথম হইতে মোট ২৪ খানি পাতায় রবীন্দ্রনাথ 'তাসের দেশ' আখ্যায়িকার যে খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা সম্ভবতঃ প্রথম খসড়া, পুরাপুরি নাটকের আকার লয় নাই এবং আখ্যানকথন অঙ্গীকার করিয়া দুইটি অধ্যায়ে বা দৃশ্যে নিবদ্ধ— প্রথমতঃ রাজপুত্রের স্বরাজ্যে, দ্বিতীয়তঃ সমুদ্রবেষ্টিত তাস-দ্বীপে। মোটের উপর কবি প্রত্যেক পাতার উপর-পিঠে বা বিজোড় পিঠে লেখেন, সংযোজন বা পরিবর্তন করিতে প্রয়োজন হইলে সামনের জোড় পৃষ্ঠাতেও লেখেন— এরূপ পৃষ্ঠার সংখ্যা অল্প।

রবীন্দ্রনাথ আখ্যায়িকা শুরু করার আগে মলাট-লগ্ন পুস্তানির কাগজে অল্প কিছু লিখিয়া থাকিলেও, কালী-কলমের স্বচ্ছন্দ সাবলীল রেখাজালে পাশ-ফেরানো এক সুন্দর নারীমুখের কল্পনায় সে লেখা ঢাকিয়া দিয়াছেন।

প্রথম পৃষ্ঠায় 'হে নবীনা' গানের সুপরিচিত পাঠ লেখার পর রেখাজালে জড়াইয়া, ওই স্থানে উহা অগ্রাহ্য ইহাই বুঝাইয়াছেন। জোড় পৃষ্ঠার মধ্যে রচনা আছে কেবল ২, ১০, ১৪, ২৬, ৩৪, ৩৮ ও ৪২ অঙ্কিত পৃষ্ঠায়, নহিলে ধারাবাহিক রচনা চলিয়াছে ৩, ৫, ৭, ৯ ইত্যাদি বিজোড় পৃষ্ঠার আশ্রয়ে। এভাবে পৃ ১১'র আধারে 'প্রথম আলোর চরণধ্বনি' গানটি আনুপূর্বিক লিখিয়া কাটিয়া দেওয়ার পরে সম্মুখীন '১০' পৃষ্ঠায় বিকল্প গানের কেবল প্রথম ছত্র লিখিয়া রাখিছেন : পাখী আমার নীড়ের পাখী / [১] দ্বিতীয় দৃশ্য বা অধ্যায় সবটা কিম্বা কিছুটা লেখার পর পৃ ২৬-ধৃত গানটি উহার প্রবেশক-রূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকিবে তাহা স্পষ্ট হয় ভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে[২], কেননা সূচনায় 'আমি ফিরব না' এবং শেষে 'ভয়ে··· ফিরব না' কবি নিজে নকল করিয়া নিজেই কাটিয়া করিয়াছেন 'ওরা ফিরবে না' এবং 'ওদের··· ছিঁড়বে না'।

পৃ ৩৪, যে দু-চার কথা কবির হস্তাক্ষরে দেখা যায় (×আজি বহিছে× / পানিমে মীন / ঝাঁপতাল), তাহা নাটকের কোনো গান সম্পর্কে যদি বা হয়, নাটকের পাঠ হইতে নিঃসম্পর্কিত।

পৃ ৩৮-ধৃত একটি বাক্য (৬টি পদ) সম্মুখীন '৩৯' পৃষ্ঠায় কোথায় বসিবে বুঝিয়া, বর্তমান পাঠ-সংকলনে সেই স্থলেই বসানো হইয়াছে।

পৃ ৪২, বিচ্ছিন্ন একটি মাত্র পদ : জগতে / তাসের দেশ'এর ভাবনার সহিত কোথাও কোনো নিগূঢ় যোগ আছে কিনা বলা যায় না।

পৃ ৪৭, ফাল্গুনীর সুপ্রসিদ্ধ শেষ গানের[৩] সুরে সুর মিলাইয়া দুই নাটকের একই আনন্দময় পরিণাম ঘোষণা করিয়া তাসের দেশ'এর এই প্রথম খসড়া শেষ হইলে, অব্যবহিত বিজোড় পৃষ্ঠায় কবি কোনো-এক সময়ে আরও যাহা লেখেন তাহার সহিত আলোচ্য নাটকের কোনো সম্পর্ক নাই।[৪]

কবির লিপিবিন্যাসের অপ্রত্যাশিত এক বৈচিত্র্য দেখা যায় এই পাণ্ডুলিপিতে আর তাহার কথঞ্চিৎ মিলও আছে বোধ করি 'মালতী-পুঁথি'তে (সংরক্ষিত রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপির মধ্যে প্রাচীনতম); 'ক্রুদ্ধ' স্থলে তিনি দুইবার লেখেন 'ক্রুদ্ধ', পর পর ৩৩ ও ৩৫ অঙ্কিত পৃষ্ঠায়। 'ক্রুদ্ধ' বরাবর ছাপা হইয়াছে আর অন্যরূপ ছাপিবার কথাও নয়।[৫]

১ এই পাণ্ডুলিপির ধারাবাহী অব্যবহিত পরের সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি যথাক্রমে ৯৬।১, ৯৬।২, ৯৬।৩, ৯৬।৪ ও ৯৬।৫— প্রথমখানি নীল পুরু কাগজের মলাটে রুল-টানা "Bull Dog" Ex. Book, No. 4 এবং বাকিগুলির প্রত্যেকটি পুরু বেগুনি কাগজের মলাটে রুল-টানা "The Star" Ex. Book, No. 2

৯৬।১ পাণ্ডুলিপিতে, কবিকর্তৃক সম্পূরণের ও সংশোধনের যথেষ্ট অবকাশ রাখিয়া ৯এ খাতার যথাযথ নকল করিতে থাকেন অন্যে। কিন্তু সে নকলের সমতালে বা সে নকল শেষ না হইতেই কবি স্বয়ং প্রবৃত্ত হন সবটার পুনর্লিখনে। তাহাতে দেখি মূল খসড়ার তৃতীয় পৃষ্ঠা-অনুসারে 'আমি চঞ্চল হে / আমি সুদূরের পিয়াসী' এটুকু লেখা হইতে না হইতে কবি তাহা কাটিয়া 'ঐ সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে বাজল ভেরী বাজল ভেরী' পুরা গানটি লেখেন ও পরে বর্জনও করেন। মূলের নবম পৃষ্ঠার ইঙ্গিতে 'পাখী আমার নীড়ের পাখী' গানটি সম্পূর্ণ লেখার পরে তাহাও লাঞ্ছিত বা বর্জনচিহ্নিত হয়।

প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায়, ৯এ।পৃ১৩-ধৃত 'তোমার মন বলে চাই চাই গো' গানটি পরের পাণ্ডুলিপিতে (৯৬।১) সবটাই রাজমাতার গেয় হওয়ায়, উহাতে 'হারিয়ে যেতে হবে / তোমায় ফিরিয়ে পাবে তবে' এরূপ পরিবর্তন হয়।

৯এ।পৃ১৭-ধৃত 'কেন আমায় পাগল করে যাস' গান সবটা অপরে লিখিবার পরে তাহা বাদ দিয়া 'পথিক হে ঐ যে চলে ঐ যে চলে' গানটি কবি স্বহস্তে লিখিয়া দেন আবার বর্জনও করেন।

এইভাবে যথোচিত ক্রমে ৯এ। পৃ২১-ধৃত 'জয়যাত্রায় যাও গো' লেখা হইলে কবি তাহাও বাদ দেন। 'হেরো সাগর উঠে তরঙ্গিয়া' হইতে এই পাণ্ডুলিপির (৯৬।১) বাকি

সবটাই কবি স্বহস্তে লেখেন। তাহাতে দেখি—

২ মূল খসড়া ৯এ।পৃ২৬-ধৃত 'আমি ফিরব না' গান যথাযথ তুলিয়া লওয়ার পর 'আমি' স্থলে 'ওরা' এবং শেষ ছত্রের সূচনায় 'ভয়ে' স্থলে 'ওদের' পাঠ প্রবর্তন করা হয়। অতএব গানটি আর রাজপুত্রের গেয় রহিল না, তাঁহার কোনো বক্তব্য প্রকাশ করিল না, হইয়া পড়িল কূলের কাছে নৌকাডুবি করিয়া নূতন দেশে উত্তরণের ভূমিকা বা ভবিষ্যদ্‌বাণী। আমাদের জানা-চেনা কোনো পাত্র-পাত্রীর গান নয়; নেপথ্য হইতে সুর ভাসিয়া আসিবে, কবি এমনও ভাবিয়া থাকিতে পারেন।

৩ 'আয় রে তবে মাত রে সবে আনন্দে' ইত্যাদি। যুগপৎ বিশ্বপ্রকৃতিতে ও মানবজীবনে জরা বা জড়ত্বের মলিন আবরণ ও বিশীর্ণতা ঘুচাইয়া নবপ্রাণে নবযৌবনে উত্তরণ যেমন ফাল্গুনীর (১৩২২) তেমনি তাসের দেশেরও (১৩৪০) বিষয়বস্তু। নিরর্থ আচারের নিষ্ফল পুনরাবৃত্তির বিরুদ্ধে অভিযান অচলায়তনেও (১৩১৮) উদ্দেশ্য। তবে 'তাসের দেশ'এ যৌবনের তথা প্রাণের আবেগোল্লাসের অভিঘাত যেমন আরও প্রবল, প্রাণহীন পুনরাবৃত্তির হাস্যকরতা তেমনি আরও প্রকট।

৪ ইহাতে ১৩৪০ কার্তিকে মুদ্রিত 'চোরাই ধন' গল্পের সূচনার প্রথম (?) খসড়া পাওয়া যায় এরূপ:

সকলকেই বিবাহ করতে হবে এই একটা মস্ত ভুল 'অনেক কাল থেকে পেয়ে বসেচে সমাজকে'। সব বড়ো জিনিষেরই মূল্য দিতে হয়— মূল্য দেবার প্রয়োজন আছে বিবাহেরও, শুধু মন্ত্র পড়লেই হয় না। মূল্য কি সকলের হাতে আছে? কাজ চালাতে হয় সমাজের অনুজ্ঞাপত্র নিয়ে; সেটা যেন 'কনস্টেবলের' মান,— যা কিছু তার প্রতাপ, তার নিষ্ঠুর হবার অধিকার, উপরিওয়ালার দেওয়া। সে অতি সামান্য অতি অধম 'উর্দি খুলে নিলেই'। /

উদ্ধৃতি চিহ্নে ঘেরা অংশের বর্জিত পূর্বপাঠ যথাক্রমে—

(১) সমাজকে অধিকার করে আছে

(২) পাহারাওয়ালার

(৩) উর্দির বাইরে

৫ অব্যবহিত পরের পাণ্ডুলিপিতেই (৯৬।১) রবীন্দ্রনাথ এই লিপিপ্রমাদ পরিহার করেন। মালতীপুঁথিতে কতকটা এরূপ প্রমাদ হয় তৃতীয়-সর্গ কুমারসম্ভবের অংশবিশেষের মর্মানুবাদ করিতে গিয়া। ইহা 'মদনদহন' শিরোনামে রবীন্দ্রনাথের রূপান্তর কাব্যে (বৈশাখ ১৩৭২) মুদ্রিত এবং পাণ্ডুলিপিচিত্ররূপেও প্রদর্শিত। সেই স্থলে সংকলিত উনশেষ শ্লোকের চিত্ররূপে একটি ছত্রশেষে পাওয়া যায়: ক্রদ্ধ অতিশয় / যথাস্থানে কেবল 'উ' কার যোগ করা হয় নাই। এই রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল ১৩, এরূপ অনুমান করা হয়।

রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি ৯এ

এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য পাণ্ডুলিপি

'তাসের দেশ' ১২৯৯ আষাঢ়ের সাধনা মাসিক পত্রে প্রচারিত ও পরে গল্পগুচ্ছে সংকলিত 'একটা আষাঢ়ে গল্প' আখ্যায়িকার নাট্যরূপ। মধ্যে অন্যূন চার দশকের ব্যবধান। অত্র সংকলিত প্রাথমিক খসড়ার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা পরিপূর্ণ নাট্যরূপ লয় নাই। তাহা ছাড়া দেখা যায় ইহাতে কেবল দুইটি দৃশ্য— রাজপুত্রের আপন দেশে ও দ্বীপান্তরে তাসের দেশে।[১] প্রথমতঃ ১৭টি গান ব্যবহারের কল্পনা ছিল দেখিতে পাই—

১ আমার হৃদয় আজি যায় যে
২ আমি চঞ্চল হে
৩ হে নবীনা
৪ পাখী আমার নীড়ের পাখী
৫ তোমার মন বলে
৬ কেন আমায় পাগল করে যাস
৭ জয়যাত্রায় যাও গো
৮ হেরো সাগর ওঠে[২]
৯ আমি ফিরব না আর
১০ এলেম নতুন দেশে
১১ আমরা চিত্র, অতি বিচিত্র
১২ আমরা নূতন যৌবনেরি
১৩ চলো নিয়মমতে
১৪ মোরা চলব না
১৫ ওগো শান্ত পাষাণ মূরতি
১৬ ইচ্ছে
১৭ আয় রে তবে, মাত রে সবে আনন্দে

ইহার মধ্যে সংখ্যা ১, ২, ৪, ৬-৯, ১৪, ১৭ পুরাতন রচনা ; সংখ্যা ৮ পুরাতন কবিতায় কথায় নূতন সুরারোপ। ইহাও দেখা যায়, তাসের দেশ প্রথাসম্মত নাট্যরূপ প্রথম যখন লয় তখন প্রথম পরিকল্পনার সংখ্যা ১, ২, ৪, ৬, ৭, ৯, ১৪, ১৭ এই আটটি পুরাতন গান (আদৌ তাসের দেশের জন্য লেখা নয়) বাদ দেওয়া গেলেও, প্রথম ও শেষ গানের স্থলবর্তী হয় আর-দুইটি পরিচিত পুরাতন গান : 'হারে রে রে রে রে' ও 'তুমি কোন্ পথে যে এলে পথিক'। (দ্বিতীয় সংস্করণে পুনশ্চ পরিবর্তনের ফলে এ দুটির বর্জন ও নূতন গানের প্রযোজনা : 'খরবায়ু বয় বেগে' ও 'বাঁধ ভেঙে দাও'।) সব-সুদ্ধ নূতন সংযোজন —

১ হারে রেরে রেরে (অচলায়তনের গান)
২ যাবই আমি যাবই (পুরাতন কবিতায় সুর-সংযোজন)[২]
৩ হা-আ-আ—আই
৪ হাঁচ্চো:
৫ জয় জয় তাসবংশ-অবতংস
৬ ইস্কাবন চিঁড়েতন হরতন[৩]
(চিঁড়েতন, হর্তন, ইস্কাবন)

৭ হে মাধবী দ্বিধা কেন (পুরাতন গান)

৮ আমি ফুল তুলিতে

৯ ঘরেতে ভ্রমর এল (অচলায়তনের গান)

১০ তোমার পায়ের তলায় যেন গো

১১ উতল হাওয়া লাগল আমার

১২ বিজয়মালা এনো

১৩ হে নিরুপমা (পুরাতন কবিতায় সুর-সংযোজন)[৪]

১৪ তুমি কোন্ পথে যে এলে (পুরাতন গান)

এগুলির মধ্যে কোন্ গান কোন্ রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে নাটকের অঙ্গীভূত করা হয় তাহার বিবরণ—

১-২ পাণ্ডু. ৯৬। ১

৩-৬ পাণ্ডু. ৯৬। ২

৭-১৩ পাণ্ডু. ৯৬। ৪[৫]

১৪ পাণ্ডু. ৯৬। ৫

নূতন চতুর্দশটি গানের অর্ধেক (সংখ্যা ৮-১৪) রহিয়াছে নূতন-সংযোজিত নাটকের শেষ দৃশ্যে। 'নূতন-সংযোজিত' বলার অর্থ, তাসের দেশের যে প্রথম খসড়া (প্রায় আখ্যায়িকা-রূপ) রবীন্দ্রবীক্ষায় ছাপা হইল (রবীন্দ্র-পাণ্ডু. ৯এ) তাহাতে নূতন সংযোজন। সমুদ্রপারের রাজপুত্র যে নূতন প্রাণের ও নবযৌবনের বাণী আনিয়াছে তাহা সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করা গেল না (প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বরণ করা হয় ৯এ -ধৃত খসড়া-রূপে), তাহার প্রথম অভিঘাতে দুলিয়া উঠিল রানী ও রাজকুমারীদের মন অথচ দ্বিধাও রহিল, এজন্যই দৃশ্যশেষে (উনশেষ দৃশ্য) 'হে মাধবী, দ্বিধা কেন' গানের উপযোগিতা। শেষ দৃশ্যে বিস্তারিতভাবে দেখানো হয় তাসের রাজ্যে, হরতনী চিঁড়েতনী রুইতন ছক্কা পঞ্জা দহলা সকলের মধ্যেই পূর্বোক্ত অভিঘাতের নানারূপ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া— এবং পরিণামে অবশ্যই প্রাণের ও যৌবনের জয়, তাহার অভিনন্দন : তুমি কোন্ পথে যে এলে পথিক ইত্যাদি।

অর্থাৎ বলা চলে, রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি ৯এ হইতে প্রথম-প্রকাশিত তাসের দেশ (১৩৪০) নাটকে উত্তরণের অন্তর্বর্তী সোপান হইল রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি ৯৬।১-৫। তন্মধ্যে ৯৬।১ খাতা-খানিতে ৯এ'র নকল শুরু হয় মাত্র অন্যের হাতে। অল্প পরে ঐ খাতাতেই নকলের অংশ নানাভাবে কাটিয়া-কুটিয়া রবীন্দ্রনাথ নূতনভাবে লিখিতে থাকেন, কিন্তু এ খাতায় 'আমরা চিত্র, অতিবিচিত্র' এই গানে আসিয়া থামেন খাতার ১০খানি শাদা পাতা পড়িয়া থাকিতেই। রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি ৯এ'র সহিত মিলাইয়া দেখিলে বলিতে পারি, লেখা তখনও শেষ হয় নাই। ইহাও দেখি— খাস তাসের দেশে (খাতার দ্বিতীয় দৃশ্যে) যে-সব ঘাত-প্রতিঘাত তথা ঘটনা, এ খাতায় তাহা আখ্যানই রহিয়াছে, নাট্যরূপ লয় নাই। এই দৃশ্য হইতেই

('প্রথম' দৃশ্য, তাসের দেশ, ১৩৪০) কবি পুনরায় নূতন করিয়া লিখিতে শুরু করেন ৯৬।২ চিহ্নিত খাতায় এবং তাহা রীতিমত নাট্যরূপও লয়। খাতার শেষ পাতায় শেষ ছত্র: সম্পাদক ॥ (বুক চাপড়াইয়া) হায় কুষ্টি হায় কুষ্টি, হায় কুষ্টি। / দ্রষ্টব্য তাসের দেশ (১৩৪০), পৃ ৪১, প্রথম দৃশ্যে (পাণ্ডুলিপিতে 'দ্বিতীয়') রাজপুত্রের 'ওগো শান্ত পাষাণমূরতি' গান গাওয়ার প্রতিক্রিয়া।

রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি ৯৬।৩, আগের খাতায় যাহা লেখা হইয়াছিল নানা ভাবে সংস্কার করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাহাই পুনশ্চ লিখিতে থাকেন। সেই সংস্কারের অন্যতম ফল দৃশ্য-ভূমিকায় 'ওরা ফিরবে না আর ফিরবে না আর ফিরবে না রে' পুরা গানটি লেখার পরেও কবি উহা কাটিয়া দেন (গ্রন্থে স্থান পায় নাই)। 'ওগো শান্ত পাষাণমূরতি সুন্দরী' এই গান অবধি লিখিয়া শেষ বিজোড় পৃষ্ঠার শেষ 'রুল'টিতে পৌঁছিয়া এ খাতার লেখা শেষ হয়। দ্রষ্টব্য তাসের দেশ (১৩৪০), পৃ ৩৯। গ্রন্থের পাঠের সহিত এ খাতার পাঠের মিল সমধিক। ৯৬।২'এর পাঠ সম্পর্কে তাহা বলা যায় না।

রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি ৯৬।৪, আগের খাতার সুস্পষ্ট অনুবৃত্তি: অমাত্যবর্গ ॥ একী অনিয়ম, একী অনাচার।৬... যম তারে ঠেলে ঠেলে, নেড়ে চেড়ে যায় ফেলে / বলে মোর নাহি প্রয়োজন। / দ্রষ্টব্য তাসের দেশ (১৩৪০), পৃ ৩৯-৬৫। এ খাতাতেও শেষ বিজোড় পৃষ্ঠার শেষ 'রুল' অবধি লেখা হইয়াছে।

রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি ৯৬।৫, আগের খাতার যথোচিত অনুবৃত্তি: শোনো বিদেশী।... তোমার মালার গন্ধে তারি আভাস / আমার প্রাণে বিহারে ॥ / দ্রষ্টব্য তাসের দেশ (১৩৪০) পৃ ৬৫-শেষ। এ খাতায় কেবল চারিটি বিজোড় পৃষ্ঠার ব্যবহার করা হয় (প্রথম মলাটের ভিতর পিঠেও পরিবর্তিত পাঠ-বিশেষ লেখা), বাকি সব পাতা বা পৃষ্ঠা শাদা রহিয়াছে।

আলোচিত পাঁচখানি রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায় যে, প্রথম খাতাখানিতে অন্যের হাতের লেখা অল্প থাকিলেও উহার অধিকাংশ এবং অন্যান্য খাতার আদ্যন্ত রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে লিখিয়াছেন। প্রথম খাতার (৯৬।১) প্রথম দৃশ্যের (প্রথম-সংস্করণ গ্রন্থে "ভূমিকা") অবিচ্ছিন্ন অনুবৃত্তি পাওয়া যায় ৯৬।৩-৫ এই তিনখানি খাতায়। (৯৬।২ খাতাখানিতে যে পাঠ ছিল তাহার পরবর্তী পাঠ ৯৬।৩'এর অঙ্গীভূত ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে।) এজন্য ঐ তিনখানি খাতাকে একখানি খাতা বলিয়া গণনা করিলেও ভুল হয় না।

উত্তরটীকা

১ তাসের দেশের প্রথম সংস্করণে (১৩৪০) প্রথম দৃশ্যটিকে "ভূমিকা" বলায় পরের দুইটি দৃশ্যকে যথাক্রমে 'প্রথম' ও 'দ্বিতীয়' বলা হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে তথা তাসের দেশের পরবর্তী সংস্করণে (১৩৪৫) 'ভূমিকা'টি প্রথম দৃশ্য গণ্য হওয়ায়, বাকি দুটি যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয়।

২ এক কবিতার তথা একই গানের দুই অঙ্গ। তুলনীয় ক্ষণিকা (১৩০৭)-ধৃত কবিতা: বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ। কবিতার প্রথম স্তবক বর্জিত; স্তবক ২, ৪, ৩ ও ৫ পরে পরে গৃহীত কিন্তু নানাভাবে পরিবর্তিত।

৩ আলোচ্য পাণ্ডুলিপিগুলির (৯৬।২ ও ৬) ও প্রথম সংস্করণের এই পাঠ ('হরতন' বা 'হর্তন'এ ছত্রসমাপ্তি) কবিতার মিলের হিসাবে ভালো ও কৌতুকজনক তাহাতে সন্দেহ নাই। সুর-বিহারের সুবিধার খাতিরেই পরে বদল করা হয় কি?

৪ তুলনীয় ক্ষণিকা-ধৃত: অবিনয়। কবিতার চতুর্থ স্তবক বাদে তৃতীয়, পঞ্চম, প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবক আংশিক পরিবর্তনে গৃহীত।

৫ পাণ্ডুলিপির শেষ দৃশ্যে— রুইতনী ॥ মনে মনে তাকেই তো ডাকচি। · দহলা ॥ এখানে থাকা নিরাপদ নয় আমাকে সুদ্ধ এরা বিপদে ফেলবে! (দ্রুত প্রস্থান)/এই সংলাপের অবকাশে একটি পুরাতন গান: আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে দোলাও ইত্যাদি। আরও একটি গানের কথা এখানেই কবি চিন্তা করেন, সেটি উক্ত গানের সম্মুখীন পৃষ্ঠায় সবটা লিখিয়া কাটিয়া দিয়াছেন: আমায় দাও গো ব'লে ইত্যাদি। তুলনীয় তাসের দেশ (১৩৪০), পৃ ৫৯, হরতনী-দহলার সংলাপ। পাণ্ডুলিপিতে 'হরতনী' স্থলে রুইতনী আর সংলাপও তুলনায় সংক্ষিপ্ত।

৬ প্রথম সংস্করণ হইতেই এ কথা বলেন রানী। দ্রষ্টব্য পৃ ৩৯ তথা দ্বিতীয়-সংস্করণ তাসের দেশ, পৃ ৫১। ইহা কি কোনোরূপ অনবধান-জনিত নয়? 'ওগো শান্তপাষাণমুরতি সুন্দরী' গানে রানীর এ প্রতিক্রিয়া কি প্রত্যাশিত?

পাণ্ডুলিপি-পরিচয়

শান্তিনিকেতনস্থ রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ : রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি ১১১

সংরক্ষণের উদ্দেশে আজও নূতনভাবে বাঁধানো হয় নাই। পাণ্ডুলিপির রবীন্দ্রকরধৃত আকার-প্রকার প্রায় অক্ষুণ্ণ। ভবিষ্যতে নূতনভাবে বাঁধাইতে হইলে পাতাগুলি প্লাস্টিকে বা কাচ-কাগজে ঢাকিতে হইবে। তখন কোনো পাতাই ছিন্ন করা বা trim করা না হয় এ বিষয়ে অবহিত থাকা প্রয়োজন। ফর্মা বাঁধার সুতা খুলিয়া অখণ্ড পাতাগুলি (প্রত্যেক 'আডোট' পাতায় ৪ পৃষ্ঠা) পৃথক্‌ভাবে mount করা ও পুনশ্চ বাঁধাই করা বা পুস্তকাকারে সেলাই করা অসাধ্য নয়। এরূপ না করায় অনেক সময় মূল্যবান পাণ্ডুলিপির ক্ষতি হয় (ভাষায় বা বিষয়ে অনভিজ্ঞ দপ্তরীর পক্ষে লেখার ধার ঘেঁষিয়া কাঁচি চালানো বিরল ঘটনা নয়), প্রসঙ্গক্রমে এ কথার উল্লেখ করা গেল।

রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি ১১১

বলাকা গীতপঞ্চাশিকা গীতলেখা গীতিবীথিকা কাব্যগীতি The Fugitive° ও Poems (1943) -ধৃত গান / কবিতা।

রচনার স্থান : শান্তিনিকেতন শ্রীনগর 'মার্তণ্ড' শিলাইদহ কলিকাতা তোসামারু-জাহাজ / চীন-সমুদ্র।

কাল যতদূর জানা যায় : ভাদ্র ১৩২২ - মাঘ ১৩২৪।

পাণ্ডুলিপির আকার-প্রকার— মলাট : লালচে-বাদামী রেক্সিনে বাঁধা। সামগ্রিক মাপ : ২০.৭ × ১৩ × ১ (পুট) সেন্টিমিটার।

The / "Pall Mall" / Note Book. / No. 3. বিক্রেতা : John Walker & Co. Ltd. / London.

রুল-টানা পাতা। প্রতি পৃষ্ঠায় অদৃশ্যপ্রায় ২৮টি সমান্তর রেখা। বাহিরের দুটি কোণ গোল-মতো কাটা। মাপ : ২০.৫ × ১২.৯ সে. মি.। পেন্সিলে লেখা অধিকাংশ। যে দিকে বিলাতি কোম্পানির ছাপা মুখপাত তাহার উল্টা দিক হইতে লেখা শুরু।

০ প্রকাশকাল অজ্ঞাত। PRIVATE / মলাটে ছাপা। অর্থাৎ, বিক্রয়ার্থে মুদ্রিত হয় নাই। মূল্য লেখা নাই। মুদ্রক : জগদানন্দ রায়, শান্তিনিকেতন প্রেস। পলাতকার অনেকগুলি কবিতার ইংরেজি রূপান্তর (গীতিবীথিকার অন্তত একটি) থাকায় ১৯১৮ বা ১৯১৯ খৃস্টাব্দে প্রচারিত মনে হয়। এ অনুমানের সমর্থন, পিয়ার্সনকে-লেখা কবির ১২ ডিসেম্বর ১৯১৮ তারিখের চিঠিতে। ইহাও জানা যায়, বুঝি ১২ খানির বেশি ছাপা হয় নাই। ইহার বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে।

কোম্পানির মুখপাত ও দুই দিকের দুইখানি সাদা পুস্তানি গণনা করিলে বর্তমান পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৬২। মুখ্য রচনাংশ : পৃ ৫-১৪৩।[১] খাতা উল্টাইয়া (যে দিকে ছাপা মুখপাত) লেখা : পৃ ১৫৬-১৪৬[১] / গণনার সুবিধার জন্য রচনাপঞ্জীতে এই কয় পৃষ্ঠার উল্লেখ পৃ '১-'১১।

কোনো লেখা নাই : পৃ ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২, ১৮, ২২, ২৪, ২৬, ২৮, ৩০, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪২, ৪৪, ৪৬, ৪৮, ৫২, ৫৪, ৫৬, ৫৮, ৬০, ৬২, ৬৪, ৬৬, ৬৮, ৭০, ৭২, ৭৬, ৭৮ (১টি শব্দ), ৮০, ৮২, ৮৪, ৮৬, ৮৮, ৯৬, ৯৮, ১০০, ১০২, ১০৬, ১০৮, ১১০, ১১৪, ১১৬, ১১৮, ১২০, ১২২, ১২৪, ১২৬, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৫১, ১৫৭-১৬২ (মোট ৬ পৃষ্ঠা)

যে পৃষ্ঠার লেখা সর্বৈব বর্জনচিহ্নিত : পৃ ৩৩, ৭৫, ৯০, ১৩৫, ১৪০, ১৪৩।

বিচিত্রিত লেখাঙ্কন-যুক্ত : পৃ ৬৭, ৭১, ৭৩, ৮১, ৮৩, ৮৫।

পাণ্ডুলিপিতে পেন্সিলে লেখা পৃষ্ঠাঙ্কগুলি রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা নয়, পরবর্তীকালে আরোপিত।

পুস্তিকাখানিতে ৬টি ফর্মা, ফর্মায় পৃষ্ঠাসংখ্যা কখনো ২৮ কখনো ২৪— হয়তো কতকগুলি পৃষ্ঠা ছেঁড়া হইয়াছে। পৃ ৯ ও ৯১, ৯২ ও ৯৩, ইহাদের অন্তর্বর্তী অন্তত ২ খানি পাতা (৪ পৃষ্ঠা) কাটা হইয়াছে স্পষ্টই দেখা যায়।

রচনাপঞ্জী

পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাঙ্ক, রচনার ক্রমিক সংখ্যা, শিরোনাম, সূচনা, স্থান, কাল, গ্রন্থে ও পত্রিকায় প্রকাশ যথাক্রমে পঞ্জীকৃত। শিরোনাম স্থান কাল সম্পর্কে যাহা-কিছু পাণ্ডুলিপি-বহির্ভূত অথচ অন্যত্র জানা যায়, বন্ধনীমধ্যে উল্লিখিত।

গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার নাম প্রথমে সম্পূর্ণ উল্লেখ করার পর বারান্তরে সংক্ষেপে দেওয়া যাইতে পারে। ফলে গীতপঞ্চাশিকা = গী. প.। প্রবাসী = প্র.। অতঃপর সংখ্যা-দ্বারা মাস বর্ষ ও পৃষ্ঠাঙ্কের নির্দেশ।

১ ॥ ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া বাহুল্য। খাতা উল্টাইয়া ২ ছত্রে লেখা :

Industrial activity পাওয়ার
moral activity · ত্যাগের /

১ অন্তর্বর্তী অনেকগুলি পৃষ্ঠা রচনারিক্ত, কেননা এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ সাধারণতঃ কাগজের এক পিঠে লিখিয়াছেন। দুই পিঠে লেখা ব্যতিক্রম বলা যায়। পরে রচনারিক্ত পৃষ্ঠাগুলির হিসাব দেওয়া হইয়াছে।

৫ ॥ ১ ॥ আমার একটি কথা বাঁশি জানে। শান্তিনিকেতন
ভাদ্র [১৩২২]। গীতপঞ্চাশিকা

৭ ॥ ২ ॥ [নিশীথ-রাতের বাদল-ধারা]। আমার নিশীথ রাতের। শান্তিনিকেতন
আশ্বিন [১৩২২]। গী. প.। প্রবাসী ৮।১৩২২।১২৯

৯ ॥ ৩ ॥ [ডাক]। তোমার নয়ন আমায় বারে বারে। শান্তিনিকেতন
আশ্বিন ১৩২২। গীতলেখা ১। প্র. ৭।১৩২২।১

১১ ॥ ৪ ॥ [পথভোলা]। কোন্ ক্ষ্যাপা শ্রাবণ। শান্তিনিকেতন
আশ্বিন ১৩২২। গী. প.। প্র. ৭।১৩২২।১

১৩ ॥ ৫ ॥ [রাতে ও সকালে]। কাল রাতের বেলা গান এল। গী. প.। প্র. ৮।১৩২২।১২৯

১৫ ॥ ৬ ॥ [মানসী[২]]। তরুণ প্রাতের অরুণ আকাশ। শ্রীনগর। কাশ্মীর
৭ই কার্তিক [১৩২২]। গী. প.। বলাকা[২]। মানসী[২] ১০।১৩২২।৬১৩

১৪ ॥ ৭ ॥ The morning with its virgin gold।[৩] পূর্বোক্ত রচনার রূপান্তর
The Fugitive (Private), *No. 58*

১৭।১৬ ॥ ৮ ॥ আজ আলোকের এই ঝর্না।[৪] মার্তণ্ড। কাশ্মীর
৯ই কার্তিক [১৩২২]। গী. প.। তত্ত্ববোধিনী ১১।১৩২২।২০৬

১৯-২১ ॥ ৯ ॥ [বলাকা]। সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের। শ্রীনগর
কার্তিক [১৩২২]। বলাকা। সবুজপত্র ৭।১৩২২।৪১৮

২৩-৩১ ॥ ১০ ॥ [ঝড়ের খেয়া]। দূর হতে কি শুনিস্।[৫] কলিকাতা
২৩ কার্তিক ১৩২২। বলাকা। প্র. ৯।১৩২২।২৩৩

৩২-৩৫ ॥ ১১ ॥ [নূতন বসন]। সর্ব্বদেহের ব্যাকুলতা।[৬] পদ্মা[৭] [শিলাইদহ]
[১২ই অগ্রহায়ণ ১৩২২][৮]। বলাকা। স. পত্র ৮।১৩২২।৪৬৩

৩৭ ॥ ১২ ॥ [শেক্স্‌পিয়র]। যেদিন উদিলে তুমি। শিলাইদহ। ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩২২
বলাকা। স. পত্র ৯।১৩২২।৬০৭

---

২ বলাকায় ও 'মানসী' নামে মানসী পত্রে সূচনা : আজ প্রভাতের আকাশটি এই /

৩ অনুমান করা যায়, বাংলা গানটি (সংখ্যা ৬) লেখার পরেই কবি ইংরেজি রূপান্তর করেন সম্মুখীন '১৪' পৃষ্ঠায়।

৪ '১৭' পৃষ্ঠায় যে রচনা সম্পূর্ণ লাঞ্ছিত তাহারই নূতন রূপ বা গ্রাহ্য পাঠ পূর্বপৃষ্ঠায়।

৫ সর্বশেষ স্তবক লেখার পূর্বেই রচনার স্থান-কাল লেখা হয়।

৬ পৃ ৩৩, পুরা পৃষ্ঠার লেখা লাঞ্ছিত। পৃ ৩৫, ঐ বর্জনচিহ্নের জের। পৃ ৩২ ও ৩৫, বর্জিত কবিতার নূতন রূপ।

৭ 'পদ্মা' বলিতে ঐ নামের বোট।

৮ তারিখটি সবুজ পত্র -ধৃত।

'৭ ॥ ১৩ ॥ বসন্ত [।] আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি ।[৯] ? [জোড়াসাঁকো । কলিকাতা । মাঘ ১৩২২] । গী. প.

'৭-'৮ ॥ ১৪ ॥ তুমি কোন্ পথে যে এলে পথিক ।[৯] ? [জোড়াসাঁকো । কলিকাতা । মাঘ ১৩২২] । গী. প. । প্র. ১।১৩২৩।৯৭

৩৯ ॥ ১৫ ॥ [চেয়ে দেখা] । এই ক্ষণে । শিলাইদা । ৭ই ফাল্গুন ১৩২২ । বলাকা স. পত্র ১১।১৩২২।৭২৬

৪১-৪৩ ॥ ১৬ ॥ [অপমানিত] । তোমারে কি বার বার । শিলাইদা । ৮ই ফাল্গুন ১৩২২ বলাকা । মা. ১।১৩২৩।২৪৯

৪৫-৪৭ ॥ ১৭ ॥ যে কথা বলিতে চাই । পদ্মা [শিলাইদা] । ৮ই ফাল্গুন ১৩২২ বলাকা । স. পত্র ১।১৩২২।৭২৬

৪৯-৫১ ॥ ১৮ ॥ [পথের প্রেম] । ভাবনা নিয়ে মরিস কেন । শান্তিনিকেতন । ২৯ ফাল্গুন ১৩২২ ।[১০] বলাকা । ভারতী ১।১৩২৩।২৯

৫৩-৫৫ ॥ ১৯ ॥ [যৌবন] । যৌবন রে তুই কি রবি । ৪ঠা চৈত্র ১৩২২ । প্র. ১।১৩২৩।১

৫৭-৫৯ ॥ ২০ ॥ আমি পথভোলা এক পথিক । শান্তিনিকেতন । ২১ চৈত্র ১৩২১ । গী. প.

৬১-৬৩ ॥ ২১ ॥ [চির-আমি] । যখন পড়বে না মোর পায়ের । শান্তিনিকেতন । ২৫ চৈত্র ১৩২২ । গী. প. । প্র. ১।১৩২৪।১

৯ অনুমান, রচনার ক্রম যথাযথ অনুধাবন করিতে হইলে পৃ ৩৭ -ধৃত ১২-সংখ্যক রচনার শেষে খাতা উল্টাইয়া অন্য দিকের প্রথম-দ্বিতীয় রচনা লক্ষ্য করিতে হইবে। ১৩২২ মাঘে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে ফাল্গুনীর যে অভিনয়, তাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় কেহ কেহ বলেন, এ দুটি গান ঐ নাট্যাভিনয়ে প্রযোজিত। প্রথম গানের পূর্ণপরিণত পরবর্তী রূপ পাণ্ডুলিপির অন্যত্র ; তাহাই গীতপঞ্চাশিকা-ধৃত ; তাহার রচনা : শান্তিনিকেতন, ২১ চৈত্র ১৩২২— দ্রষ্টব্য '২০' সংখ্যা।

ফাল্গুনী অভিনয়ের স্মৃতি মনে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে এমন প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় বলেন : 'আমার বহুদিন ধারণা ছিল ওইটি ('আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি' ইত্যাদি) ফাল্গুনীর গান। সে সময় (কোলকাতায় যখন প্রথম অভিনয়) প্রায়ই গাওয়া হত। ফাল্গুনীর অন্যান্য গানের সঙ্গে জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ির আবহাওয়া মাতিয়ে রেখেছিল।' দুঃখের বিষয়, সমকালীন আর-কেহ এ বিষয়ে সেই সময় বা পরে কিছু লিখিয়াছেন কিনা জানা যায় না।

১০ পৃ ৫১, ষষ্ঠ স্তবকের শেষে রচনার স্থান-কাল লেখা। বাকি ৪টি স্তবক পূর্ব পৃষ্ঠায় কোনো রকমে লিখিয়া যথাস্থানে বসাইবার সংকেত— মনে হয় পরবর্তী সংযোজন।

৬৫-৬৭ ॥ ২২ ॥ এই তো ভালো লেগেছিল। শান্তিনিকেতন। ২৬ চৈত্র ১৩২২।[১১]
গী. প.। প্র. ৭।১৩২৪।৪৭

৬৫-৬৯ ॥ ২৩ ॥ তরীতে পা দিই নি আমি। শান্তিনিকেতন। ২৬ চৈত্র ১৩২২। গী. প.
'৬৫' পৃষ্ঠার শিরে 'তরীতে পা··· চাই নি গো !' সূচনার ৪ ছত্র লিখিয়া কাটা।

৬৯ ॥ ২৪ ॥ ×I have sat idly× পূর্ব রচনার ভাষান্তর। আদ্যন্ত লাঞ্ছিত।
See *The Fugitive* (Private), No. 66 and *The Modern Review*, 4. 1918, p. 353 : The Captain Will Come to His Helm.

৭১ ॥ ২৫ ॥ তোমার হল সুরু। ২৭ চৈত্র [১৩২২]। গী. প.

৭৩ ॥ ২৬ ॥ গানের সুরের আসনখানি। ২৮ চৈত্র [১৩২২]। গী. প.

৭৫-৭৪ ॥ ২৭ ॥ আমারে বাঁধবি তোরা।[১২] ২৮ চৈত্র ১৩২২। গী. প.

৭৭ ॥ ২৮ ॥ ঐ সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে। ২৯ চৈত্র [১৩২২]। গী. প.
অরূপরতন (১৩২৬)[১৩]

৭৮ ॥ ২৯ ॥ নাহয় তোমার যা হয়েচে। ২৯ চৈত্র [১৩২২]। গী. প.

৮১ ॥ ৩০ ॥ ওরে আমার হৃদয় আমার। ৩০ চৈত্র ১৩২২। গী. প.

৮৩ ॥ ৩১ ॥ [গান] এমনি করেই যায় যদি দিন। ৩১ চৈত্র [১৩২২]। গী. প.
প্র. ৪।১৩২৪।৩৮৯

৮৫-৮৭ ॥ ৩২ ॥ [নববর্ষের আশীর্ব্বাদ]। পুরাতন বৎসরের জীর্ণ। কলিকাতা
৯ই বৈশাখ ১৩২৩। বলাকা। স. পত্র ১।১৩২৩।১

৮৯ ॥ ৩৩ ॥ তোমার[১৪] ভুবনজোড়া আসনখানি। তোসামারু। চীন সমুদ্র। ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩
গী. প.। তত্ত্ব ১২।১৩২৫।৩২০

৯১ ॥ ৩৪ ॥ [আবাহন]। মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন। [১৪ অগ্রহায়ণ ১৩২৪][১৫]
হস্তাক্ষরের প্রতিরূপ মুদ্রিত : প্র. ৯।১৩২৪।২৩০

১১ রচনার স্থান-কাল লেখার পরে 'লাগ্‌ল ভালো, মন ভোলালো' ইত্যাদি শেষ স্তবকের সংযোজন।

১২ পৃ ৭৫-ধৃত পাঠ সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া ঐ দিনেই নূতন বা প্রচলিত পাঠ লেখা হয় পূর্বপৃষ্ঠায়।

১৩ প্রথম ছত্রে পাঠান্তর : ঐ ঝঞ্ঝার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে।

১৪ গীতপঞ্চাশিকায় পদটি বর্জিত।

১৫ বসুবিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে লেখা, এজন্যই রচনা-শেষে মন্দির-প্রতিষ্ঠার তারিখই উল্লিখিত। পাণ্ডু.-ধৃত কবিতা তৎপূর্বে লেখা মনে হয়। দ্রষ্টব্য চিঠিপত্র ৬, পত্র ২৮। এই গানের অন্যান্য রূপ রবীন্দ্রসংগীত (১৩৬৯) গ্রন্থে দ্রষ্টব্য, পৃ ২১২-১৩— তন্মধ্যে

৯৩-৯৫ ॥ ৩৫ ॥ [গান] দেশ দেশ নন্দিত করি। গী. প. । প্র. ৫।১৩২৪।৫২২

৯২-৯৪ ॥ ৩৬ ॥ [The Day is Come] Thy call has sped[১৬] । *Poems*, No 59. / *The Modern Review* 9. 1917, p. 231

৯০।[১৭]৯৭ ॥ ৩৭ ॥ [শেষ গান] যারা আমার সাঁঝ সকালের গানের দীপে। পলাতকা[১৮] পূরবী[১৯] । স. পত্র[20] ২।১৩২৪।৯২

৯৯ ॥ ৩৮ ॥ ছিল যে পরানের অন্ধকারে। গী. প.

১০১ ॥ ৩৯ ॥ কবে তুমি আসবে বলে। গী.প.

১০১ ॥ ৪০ ॥ [Adventure] I shall not wait and ।[১৬] *Poems*, No. 62 *The Modern Review* 1. 1918, p. 1

১০৩ ॥ ৪১ ॥ কাঁপিছে দেহলতা ।[২১] গীতপঞ্চাশিকা। সবুজ পত্র ৫।১৩২৪।২৭৭

১০৫ ॥ ৪২ ॥ একদা তুমি প্রিয়ে। গীতপঞ্চাশিকা। ভারতী ৭।১৩২৪।৬৮৭

১০৪।১০৫ ॥ ৪৩ ॥ বেদনা দিবে যত। স্ফুলিঙ্গ

১০৭ ॥ ৪৪ ॥ ব্যাকুল বকুলের ফুলে ।[২১] গীতপঞ্চাশিকা। সবুজপত্র ৫।১৩২৪।২৮০

১০৯ ॥ ৪৫ ॥ যে কাঁদনে হিয়া ।[২১] গীতপঞ্চাশিকা। সবুজপত্র ৫।১৩২৪।২৮১

১১১ ॥ ৪৬ ॥ দুয়ার মোর পথপাশে ।[২১] গীতপঞ্চাশিকা। সবুজপত্র ৫।১৩২৪।২৮২

১১৩ ॥ ৪৭ ॥ ও দেখা দিয়ে যে। গীতপঞ্চাশিকা

১১২ ॥ ৪৮ ॥ [Elusive] She came for a moment[১৬]
The Fugitive, No. 9 and *The Modern Review* 1. 1918, p. ।

প্রথম বা আদিম (?) পাঠ ১৩১১ অগ্রহায়ণের বঙ্গদর্শনে, পৃ ৪৩৮ : বঙ্গজননী-মন্দিরাঙ্গন ইত্যাদি। 'রাগিণী ভূপালি— তাল তেওরা'। 'বড়োদারাজ গায়কবাড়ের অভ্যর্থনার উপলক্ষ্যে রচিত।'

১৬ উল্লিখিত গীতিকবিতার ইংরেজি রূপান্তর।

১৭ এই পৃষ্ঠায় এ কবিতার আদিম রূপ এবং পরবর্তী রূপেরও যৎকিঞ্চিৎ আভাস (সম্ভবতঃ ছিঁড়িয়া-লওয়া একখানি পাতার ইহারই জের চলিয়াছিল) —সমস্তই বর্জনচিহ্নিত।

১৮ পলাতকা কাব্যের পাঠই অনেকটা পাণ্ডুলিপি-ধৃত পাঠের সদৃশ। শিরোনাম : শেষ গান /

১৯ শিরোনাম : পূরবী /

২০ শিরোনাম : পরমায়ু /

২১ সংগীতের মুক্তি প্রবন্ধের অঙ্গীভূত, তদুদ্দেশে এই ৪টি (এবং সম্ভবতঃঅন্তর্বর্তী আর ২টি / সংখ্যা ৪২-৪৩) লিখিত মনে হয়। এই প্রবন্ধ সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথ ২৭. ৮.

১১৫ ॥ ৪৯ ॥ ভেঙে মোর ঘরের চাবি[22] গীতপঞ্চাশিকা

১১৭ ॥ ৫০ ॥ [বাণী]। বল বল, বন্ধু, বল। গীতপঞ্চাশিকা। [23] প্রবাসী ১০।১৩২৪।৩৩১

১১৯ ॥ ৫১ ॥ [ভিক্ষা]। আমি যখন তাঁর দুয়ারে। [কলিকাতা]। ১ জানুয়ারি ১৯১৮
[১৭ পৌষ ১৩২৪]। গীতিবীথিকা। মানসী ও মর্মবাণী ১০।১৩২৪।৫৮৫

১২১ ॥ ৫২ ॥ 1 / There sounded a voice [নৈবেদ্য ৫৭]। [24]

॥ ৫৩ ॥ 2 / The time is loud today [নৈবেদ্য-৯৫ : আজি সভ্যতার ইত্যাদি]

॥ ৫৪ ॥ 3 / Don your white robe [নৈবেদ্য-৯৩। তু : *Poems*, No. 27
or last stanza, concluding poem, *Nationalism*]

॥ ৫৫ ॥ 4 / Let me lay my heart [নৈবেদ্য-৭৯]

১২৩ ॥ ৫৬ ॥ [India's Prayer / I] / Thou hast given [তু নৈবেদ্য ৫৪।৫৬।৯৯]
Poems, No. 61 and *The Modern Review*, 1. 1918, p. 18.

১২৫ ॥ ৫৭ ॥ জাগরণে যায় বিভাবরী। গীতপঞ্চাশিকা

১২৭ ॥ ৫৮ ॥ ওরে সাবধানী পথিক।[25] গীতপঞ্চাশিকা

১২৮ ॥ ৫৯ ॥ [গান]। ওহে সুন্দর মরি মরি। গীতপঞ্চাশিকা। প্রবাসী ১২।১৩২৪।৬০৭

১২৯ ॥ ৬০ ॥ অলকে কুসুম না দিয়ো। [25] কাব্যগীতি

১৩০ ॥ ৬১ ॥ আকাশ হতে আকাশ-পথে। গীতপঞ্চাশিকা

॥ ৬২ ॥ [সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে]
সে কোন বনের হরিণ। গীতপঞ্চাশিকা। প্রবাসী ১।১৩২৫।১

১৯১৭ (১১ ভাদ্র ১৩২৪) তারিখে প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন (দ্র চিঠিপত্র ৫ / পত্র ৫৮): 'গানের লেকচারটা লেখা হয়েচে।' সংগীতের মুক্তি প্রবন্ধ প্রথম-সংস্করণ ছন্দে (১৩৪৩) এবং পরে সংগীতচিন্তা (১৩৭৩) গ্রন্থে সংকলিত।

২২ দ্রষ্টব্য : গ্রন্থপরিচয়, ডাকঘর (১৩৬৮), পৃ ৭৭। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের শেষে এবং ১৯১৮ জানুয়ারির প্রথমে ডাকঘর নাটকের অভিনয় হয় জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ির 'বিচিত্রা' হলে। তদুপলক্ষে এই গানের রচনা। এই গানের ইংরেজি অনুবাদ ৪ জানুয়ারি ১৯১৮ তারিখের ইংরেজি অনুষ্ঠানপত্রে মুদ্রিত।

২৩ প্রথম-প্রকাশিত গীতপঞ্চাশিকা গ্রন্থে (আশ্বিন ১৩২৫) গানটি থাকিলেও স্বরলিপি ছিল না, পরবর্তী সংস্করণে বা মুদ্রণে বর্জিত।

২৪ পাঁচটি কবিতার ক্ষেত্রেই বন্ধনী-মধ্যে তুলনীয় মূল কবিতার সম্পর্কে ইঙ্গিত করা গেল। (নৈবেদ্য-৫৭, অর্থাৎ নৈবেদ্যের ৫৭-সংখ্যক কবিতা।) শেষ কবিতা (India's Prayer-'এর প্রথমাংশ / মডার্ন্ রিভিয়ু দ্রষ্টব্য) বাংলা একাধিক কবিতার ভাব লইয়া রচিত মনে হয়।

২৫ মূলতঃ 'চিরকুমার সভা'র (ভারতী : ১৩০৭-১৩০৮), বহুশঃ পরিবর্ধিত।

১৩১ ॥ ৬৩ ॥ The lamp is trimmed / Jan. 31, 1918 [১৮ মাঘ ১৩২৪]

১৩২ ॥ ৬৪ ॥ [গান]। কান্না-হাসির দোল-দোলানো। গীতপঞ্চাশিকা
মানসী ও মর্ম্মবাণী ১২।১৩২৪।১১৩

১৩৩ ॥ ৬৫ ॥ আমার[২৬] পাত্রখানা যায় যদি। গীতপঞ্চাশিকা

১৩৪ ॥ ৬৬ ॥ তুমি একলা ঘরে বসে বসে। গীতপঞ্চাশিকা
॥ ৬৭ ॥ অশ্রুনদীর সুদূর পারে। গীতপঞ্চাশিকা

১৩৫ ॥ ৬৮ ॥ x Darkly xxx বলাকার অষ্টম কবিতার ভাষান্তর, পরপৃষ্ঠায় ('১৩৭') মাঝামাঝি গিয়া শেষ হয়। আদ্যন্ত অনুবাদ লাঞ্ছিত। ইহারই পরিণত পাঠান্তর: *The Fugitive*, No. 60

১৩৬ ॥ ৬৯ ॥ কোন্ সুদূর হতে আমার মনোমাঝে। গীতপঞ্চাশিকা

১৩৭ ॥ ৭০ ॥ আয় আয় রে পাগল। গীতপঞ্চাশিকা

১৩৮ ॥ ৭১ ॥ অনেক পাওয়ায় মাঝে মাঝে। গীতপঞ্চাশিকা
॥ ৭২ ॥ আজি বিজন ঘরে। গীতপঞ্চাশিকা

১৩৯ ॥ ৭৩ ॥ সবার সাথে চল্‌তেছিল। গীতপঞ্চাশিকা
॥ ৭৪ ॥ আমার সকল দুখের প্রদীপ জেলে। গীতপঞ্চাশিকা

১৪০-১৪১ ॥ ৭৫ ॥ কেন রে এই দুয়ারটুকু।[২৭] গীতপঞ্চাশিকা

১৪৩।১৪১-১৪২ ॥ ৭৬ ॥ [বিজয়ী] তখন তারা দৃপ্ত বেগের বিজয় রথে।[২৮] পূরবী
প্রবাসী ১২।১৩২৪।৫১১

পাণ্ডুলিপির উল্টা দিকে (বিলাতি কোম্পানির মুখপাত-ছাপা দিকটিতে) রচনাগুলির যে ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া যায় তাহাতে রচনাকালের হিসাবে যথাযথ পূর্বানুস্থতির নিশ্চয়তা নাই।

২৬ পদটি গীতপঞ্চাশিকায় বর্জিত।

২৭ '১৪০' পৃষ্ঠায় পর পর দুইটি পাঠ লিখিত ও লাঞ্ছিত হয়, গ্রাহ্য পাঠ রহিয়াছে পরপৃষ্ঠায়। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ বলেন, 'গানটি তাঁর বড়ো মেয়ের মৃত্যুর সময় লেখা, ১৩২৫ সনে।' (রবীন্দ্রসংগীত, ১৩৬৯, পৃ ২১০) ইহা কিংবদন্তী হইতে পারে, রচনা ১৩২৪ চৈত্রের পূর্বে ইহা ধরিয়া লওয়া যায়।

২৮ পূর্বপাঠ '১৪৩' পৃষ্ঠা জুড়িয়া লিখিত ও বর্জনচিহ্নিত হইলে, নূতন পাঠ '১৪১' পৃষ্ঠার নিম্নার্ধে ও পরপৃষ্ঠায় লিখিত। কবি-কৃত ইংরেজি রূপান্তর (অতিশয় সংহত) *Poems*'এ সংকলিত, তৎপূর্বে সাময়িক পত্রে প্রকাশ: *The Modern Review*, 6.1918, p. 5.81: The Conqueror.

'৯ ॥ ৭৭ ॥ [Speak to Me, My Friend, of Him] Speak to me, my friend/[২৯] *The Fugitive*, No. 74 and *The Modern Review* 4. 1918. p. 353

'১১-'১০ ॥ ৭৮ ॥ এস এস বসন্ত ধরাতলে।[৩০] গীতপঞ্চাশিকা

'১৩ ॥ ৭৯ ॥ [India's Prayer/II] Our voyage is begun [আমাদের যাত্রা হল সুরু][৩১] *Poems* No. 44, *The Modern Review* 1. 1918, p. 98

'১৫।'১৪ ॥ ৮০ ॥ [Despair Not] × Thy own kindred shall forsake thee × [তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে][৩২] *Poems*, No, 42 / *The Modern Review* 1. 1918, p. 237

২৯ এই পাণ্ডুলিপিতেই মূল বাংলা কবিতা রহিয়াছে, দ্রষ্টব্য : ক্রমিকসংখ্যা ৫০

৩০ মায়ার খেলা (অগ্রহায়ণ ১২৯৫) গীতিনাট্যে যে গান আছে তাহারই চমৎকারজনক রূপান্তর। কয়েক পৃষ্ঠা পূর্বে (পৃ '৭-'৮) 'আমি পথ-ভোলা এক পথিক এসেছি' ও 'তুমি কোন্ পথে যে এলে পথিক' যে দুটি গান পাওয়া যায় (পাদটীকা ৯ দ্রষ্টব্য) সে দুটি সম্ভবত: ১৩২২ মাঘে ফাল্গুনীর অভিনয়ে প্রযুক্ত। আমাদের বিশেষভাবেই মনে হয়, বর্তমান গানটি (বর্তমান পাণ্ডুলিপি-ধৃত পাঠ ও গীতপঞ্চাশিকা-ধৃত রাগরূপ) ঐ নাট্যাভিনয়ে ব্যবহার করা না হইলেও ঐ উদ্দেশে বা উপলক্ষ্যে উদ্‌ভাবিত।

পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় আনুপূর্বিক পাঠ একাদশ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়া গেলে, 'এস অরুণ-চরণ কমলবরণ··· কর্মে বচনে মনে এস এস' এই বর্জিত বা ভ্রষ্ট পাঠ পুনশ্চ যোগ করা হয় দশম পৃষ্ঠায় লিখিয়া। পরবর্তী পাঠপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

৩১ দ্রষ্টব্য : ক্রমিক সংখ্যা ৫৬। গ্রন্থে দুটি ভিন্ন কবিতা হইলেও, বিশেষ উপলক্ষ্যে ও সাময়িক পত্রে '৫৬' ও '৭৯' মিলাইয়া একটি রচনা : India's Prayer। উপলক্ষ্য হইল ১৯১৭ ডিসেম্বরে শ্রীমতী অ্যানি বেসান্টের সভাপতিত্বে কলিকাতায় ভারতের জাতীয় মহাসভার অধিবেশন। ২৬ ডিসেম্বর ১৯১৭ তারিখে, অর্থাৎ অধিবেশনের প্রথম দিনেই, সভামঞ্চ হইতে কবি স্বয়ং ইহা আবৃত্তি করেন। দ্রষ্টব্য উল্লিখিত মর্ডান রিভিয়ু পত্রিকার পৃ ৯৯ এবং James H. Cousins ও Margaret E. Cousins'এর *We Two Together* (1950) গ্রন্থে পৃ ৩১৬, শেষ অনুচ্ছেদ।

'৭৯' সংখ্যার তথা India's Prayer'এর দ্বিতীয় অংশের মূল বংলা কবিতা : আমাদের যাত্রা হল সুরু ইত্যাদি। রচনা: ২১ আশ্বিন ১৩১২। সংস্কার: ১৩১৭ (?) মূল কবিতা রবীন্দ্রসদনের ১১০-সংখ্যক রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়।

৩২ দুই পৃষ্ঠায় বর্জনচিহ্নিত দুটি পাঠ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে '১৫' পৃষ্ঠায় পূর্বপাঠ 'It may be that thy own kinsmen will forsake thee' অত্যন্ত ভালোভাবে কাটা (পাঠোদ্ধার ক্লেশসাধ্য), পরবর্তী পাঠ (পৃষ্ঠা '১৪) সহজেই পড়া যায়— ইহার সহিত

'১৭ ॥ ৮১ ॥ Thou hast given me to live। ৫৬ সংখ্যায় ইহার সম্বন্ধে সব কথাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দ্রষ্টব্য পাদটীকা ২৪। ৭৯ সংখ্যার ৩১-সংখ্যক পাদটীকাও দ্রষ্টব্য। ৫৬ সংখ্যা ও ৮১ সংখ্যা আসলে এক কবিতা হইলেও উভয়ের পাঠের তুলনায় রচনার পূর্বাপর বিবেচনা করা যাইতে পারে। ৮১ সংখ্যার রচনাটি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ও সংহত হওয়ায়, মনে হয়, সম্ভবতঃ এইটিই পরবর্তী রচনা।

বিশেষ বিশেষ পাঠ -প্রসঙ্গ

'৭॥১৩॥ নবম পাদটীকা দ্রষ্টব্য। পাণ্ডুলিপি-ধৃত পাঠ (বর্জনচিহ্নিত শব্দ বা ছত্র বাদ দিয়া) সংকলন করা গেল—

বসন্ত আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি
ওগো মল্লিকা, বনের মল্লিকা,
তোমরা আমায় চেন কি ?
ওগো বসন্ত নবীন বসন্ত
ভুলে ভুলে ফিরে ফিরে এস উদাস [ী]
আমরা তোমায় চিনেচি।
বসন্ত ঘরছাড়া এই পাগলাটাকে
এমন করে কে গো ডাকে—
আমি বাজিয়ে বীণা বনের পথে
বেড়াই সঞ্চরি।
মঞ্জরী আমরা তোমায় ডাক দিয়েচি ওগো উদাসী
আমরা আমের মঞ্জরী।
বসন্ত যখন যাবার বেলা চুকিয়ে খেলা
তপ্ত ধূলার পথে
যাব ঝরা ফুলের রথে
তখন সঙ্গে কে রবি—
রব আমরা মাধবী।

সাময়িক পত্র-ধৃত পাঠ কতকটা মেলে ; *Poems*'এর পাঠ প্রায় মেলে না। গ্রন্থে, সাময়িক পত্রে এবং পাণ্ডুলিপিতে, মোট ৪টি পাঠ —এগুলি পরস্পর তুলনীয়।
মূল বাংলা কবিতা রবীন্দ্রসদনসংগ্রহের ১১০-সংখ্যক রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-ধৃত— ঐ পাণ্ডুলিপির আনুপূর্বিক আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে করা হইয়াছে। দ্রষ্টব্য, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৮, পৃ ৩৭১

যখন বিদায় বাঁশির সুরে সুরে
শুকনো পাতা যাবে উড়ে
তখন সঙ্গে কে রবি ?
তোমার সাথে২ উদাস হব ওগো উদাসী
আমরা তরুণ করবী।

এই উদ্‌ধৃতি হইতে স্পষ্ট হইবে নাটকীয় পাত্রপাত্রীর ভাবনা কবির মনেই শুধু ছিল না। লেখাতেও ফুটিয়া উঠিয়াছিল। (অবশ্য সকল পাত্রপাত্রীর নাম লেখেন নাই, আবার বর্জিত চতুর্থ ছত্রে 'মল্লিকা। তুমি বসন্ত তুমি বসন্ত' এই পাঠের দুটি 'তুমি' কাটিতে গিয়া প্রথম স্থলে মনে হয় প্রমাদবশতই 'মল্লিকা'ও কাটিয়াছেন।)

৫৭-৫৯॥২০॥ পূর্বে যে রচনা আদ্যন্ত সংকলন করা হইয়াছে তাহারই পূর্ণ পরিণত পরবর্তী পাঠ। কালীতে লেখা। প্রায় এই পাঠই গীতপঞ্চাশিকায় ও উত্তরকালে গীত-বিতানে মুদ্রিত। 'আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি' প্রথম ছত্রটি (অতিপর্বিক 'আমি' বাদ দিয়া) পাণ্ডুলিপিতে পুনঃ পুনঃ লেখা হইয়াছে ধুয়া হিসাবে—

"পথভোলা এক পথিক এসেছি। / ঘরছাড়া এই পাগলাটাকে ইত্যাদি।
"পথভোলা এক পথিক এসেছি। / যখন ফুরিয়ে বেলা ইত্যাদি।

শেষ স্তবকে— "আমি রব উদাস হব··· কাঁদনভরা হাসি হেসেছি।"

পাণ্ডুলিপিতে পুনঃ পুনঃ উদ্‌ধৃতিচিহ্নের প্রয়োগেই স্পষ্ট হয় যে, এ গানটি বসন্তের সহিত বসন্ত-পরিবার মল্লিকা মাধবী করবী প্রভৃতির সংলাপের মতো।

পূর্ব-সংকলিত পাঠের তুলনায় নূতন পাঠের ছত্রে ছত্রে কী পরিবর্তন, কোন্ ছত্রগুলিই বা নূতন যোগ হইয়াছে, তাহা সংকলিত পাঠ ও গ্রন্থের পূর্বমুদ্রিত পাঠ পাশাপাশি রাখিলেই বুঝা যাইবে।

১১২॥৪৮॥ পাণ্ডুলিপি-ধৃত পাঠই মডার্ণ্ রিভিয়ু পত্রে মুদ্রিত। অবিক্রেয় ও স্বল্পপ্রচারিত *The Fugitive* গ্রন্থে উহার রূপান্তর দেখা যায়। উভয়ের পার্থক্য কিরূপ তাহার নিদর্শন হিসাবে সূচনাংশ সংকলন করা যায় :

She came for a moment and walked away,
leaving her whisper to the south wind
and crushing the lowly flowers
as she walked away./পাণ্ডুলিপি। M. R.

She came for a moment and walked away,
stirring a throb of pain in the south wind and a flutter among
the lowly flowers as she walked away/*The Fugitive*

(রবীন্দ্রসদন সংগ্রহের মুদ্রিত পুস্তকে দেখা যায় দ্বিতীয় ছত্রে 'south' কথাটি কবি

কাটিয়া দিয়াছেন।)

১২৭॥৫৮॥ ছত্র ১১-১৪ অনেক দিনের সঞ্চয় তোর··· জয়মালা পর শিরে / এই কয় ছত্র নূতন, নহিলে গানটি পুরাতন। দ্রষ্টব্য : পাদটীকা ২৫

১২৯॥৬০॥ ছত্র ৫-৭ এস এস বিনা ভূষণেই··· উতলা নয়ন ধাঁধিয়ো/পুরাতন গানে এই কয় ছত্র নূতন সংযোজন। দ্রষ্টব্য : পাদটীকা ২৫

১৩০॥ পৃষ্ঠার নীচের দিকে লেখা : বসন্ত আগত/সখি/আজ ভয়ী রী/এই পৃষ্ঠারই 'আকাশ হতে আকাশ পথে' বা 'সে কোন্ বনের হরিণ' গানের সুরের ইঙ্গিত ইহাতে আছে কিনা রবীন্দ্রসংগীতবিদ্ বলিবেন।

১৩৭॥৭০॥ শেষ ছত্র 'তোর আপন বুকের সেই ডাকে।' ইহার পরিবর্তে পূর্বে লেখা হইয়াছিল :

ঐ বিশ্ববাসীর কান্নাহাসির অন্তরে
জাগে গভীর ছন্দ মোচনবন্ধ মন্তরে
সদা রাখিস কানে সেই বাণী
জীবন-দহন নির্বাণী

কাটিবে যে ডোর তা হলে তোর ভয় কাকে। / এই ৫ ছত্র বর্জনচিহ্নিত।

'১১-'১০॥৭৮॥ পাণ্ডুলিপি-ধৃত গ্রাহ্য পাঠ যথাযথ সংকলন করা গেল—

এস এস বসন্ত ধরাতলে
আন মুহুমুহু নব তান আন নব প্রাণ নব গান—
আন গন্ধমদভরে অলস সমীরণ
[১]আন অন্তরে বাহিরে নব নব উদ্বোধন,[১]
আন নব উল্লাসহিল্লোল
আনো আনো আনন্দ-ছন্দের হিন্দোলা
ভাঙো ভাঙো বন্ধনশৃঙ্খল
[২]আন আন উদ্দীপ্ত প্রাণের বেদনা[২] ধরাতলে।
এস থর থর কম্পিত মর্মরমুখরিত
নবপল্লবপুলকিত ফুল আকুল মালতীবল্লীবিতানে
সুখছায়ে মধুবায়ে
এস বিকশিত উন্মুখ এস চিরউৎসুক
নন্দনপথচিরযাত্রী এস পুষ্পিত[৩] চিত্তনিকুঞ্জবিতানে
গানে গানে প্রাণে প্রাণে। [পৃ '১১। উত্তরার্ধ
এস অরুণচরণ কমলবরণ তরুণ উষার কোলে
এস জ্যোৎস্নাবিবশ নিশীথে কলকল্লোল তটিনীতীরে
সুখসুপ্ত সরসীনীরে।

এস [4]তড়িৎশিখাসম ঝঞ্ঝাচরণে[4] সিন্ধুতরঙ্গদোলে
এস জাগর মুখর প্রভাতে, এস [5]প্রান্তরে নগরে[5] বনে
এস কর্মে বচনে মনে এস এস [পৃ ১০
এস মঞ্জীর-গুঞ্জর চরণে
এস গীতমুখর কলকণ্ঠে,
এস মঞ্জুল মল্লিকামাল্যে,
এস কোমল কিশলয়বসনে
এস সুন্দর, যৌবনবেগে
এস দৃপ্ত বীর [6]নব তেজে[6]
ওহে দুর্দ্দম,[7] কর জয়যাত্রা
চল জরা-পরাভব সমরে
পবনে কেশররেণু ছড়ায়ে
চঞ্চল কুন্তল উড়ায়ে। [পৃ '১১ অপরার্ধ

১-১ গীতপঞ্চাশিকায় : আন' বিশ্বের অন্তরে অন্তরে নিবিড় চেতনা। /
২-২ পাণ্ডুলিপিতে পাঠের ক্রমিক পরিবর্তন : উদ্দীপ্ত বন্ধনছেদন সাধনা / পরে 'উদ্দীপ্ত' স্থলে 'প্রদীপ্ত' ও 'উন্মত্ত' (বর্জিত কোন্ পাঠ আগে কোন্‌টি পরে বলা যায় না) এবং 'বন্ধনছেদন সাধনা' স্থলে : প্রাণের বেদনা /
৩ বর্জিত পূর্বপাঠ : পুলকিত /
৪-৪ বর্জিত পূর্বপাঠ : অগ্নিবরণ চপলচরণ /
৫-৫ প্রথমে লেখা হয় : নগরে প্রান্তরে /
৬-৬ পূর্বপাঠ : চল-চরণে /
৭ বর্জিত পূর্বপাঠ 'চঞ্চল' এবং গীতপঞ্চাশিকা-ধৃত রূপ : দুর্মদ /

অতঃপর মায়ার খেলার ও গীতপঞ্চাশিকার পাঠ দুটি পাশাপাশি রাখিয়া বিচার করিলেই শেষ পর্যন্ত মূল গানে যুগপৎ ভাবে ও ভাষায় রবীন্দ্রনাথ যে পরিবর্তন করিয়াছেন তাহার পরিমাণ ও চমৎকারিত্ব সম্যক্ বুঝা যাইবে। এই গান ফাল্গুনীতে গাওয়া হয় নাই বটে কিন্তু স্থানে স্থানে ঈষৎ পরিবর্তনের পরে উত্তরকালে নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদায় ইহার অতিশয় সার্থক ব্যবহার।

ফাল্গুনীতে কবি যৌবনের জরাপরাভব প্রাণশক্তির তেজ ও দীপ্তির জয়ঘোষণা করেন শীতশেষে বসন্ত-অভ্যুদয়ের রূপকল্পের আশ্রয়ে। তাহার সহিত সংগতি রাখিতে গিয়া বহু পূর্বে লেখা 'মায়ার খেলা'র মোহমাধুরী-মাখা স্বপ্নাবেশময় সুমধুর গানের, অর্থাৎ কথা ও সুরের

নূতন রূপান্তর ও ভাবান্তর হইবে ইহা অবশ্যই প্রত্যাশিত। সুর-তালের বিচার করিয়া থাকিবেন অথবা করিবেন গীতজ্ঞ ব্যক্তি। উপস্থিত, গানের ছন্দোবদ্ধ কথার পর্যালোচনায় দেখি (প্রচল গীতবিতান-ধৃত 'মায়ার খেলা'য় সপ্তম দৃশ্যের সূচনা, পৃ ৬৭৭)—

ছত্র ২ আন' কুহুকুহু কুহুতান প্রেমগান স্থলে : আন' মুহু মুহু নবতান আন' নবপ্রাণ নবগান

ছ ৪-৫ আন' নবযৌবনহিল্লোল, নবপ্রাণ, / প্রফুল্ল নবীন বাসনা ধরাতলে স্থলে :
আন' বিশ্বের অন্তরে অন্তরে নিবিড় চেতনা। / আন' নব উল্লাসহিল্লোল। /
আন' আন' আনন্দছন্দের হিন্দোলা ধরাতলে। / ভাঙ' ভাঙ' বন্ধনশৃঙ্খল। /
আন' আন' উদ্দীপ্ত প্রাণের বেদনা ধরাতলে। /

ছ ৯।১০'এর অন্তরে, অর্থাৎ, 'সুখছায়ে মধুবায়ে এস' এস'ইহার পরে নূতন সংযোজন :
এস' বিকশিত উন্মুখ এস' চির-উৎসুক নন্দনপথচিরযাত্রী। /
এস' স্পন্দিত নন্দিত চিত্তনিলয়ে গানে গানে প্রাণে প্রাণে /
এবং মায়ার খেলায় শেষ অংশ (স্ত্রীগণ-কর্তৃক উদ্‌গীত) 'এস' যৌবনকাতর হৃদয়ে, / এস' মিলন সুখালস নয়নে, / এস' মধুর শরম মাঝারে, / দাও বাহুতে বাহু বাঁধি, / নবীন কুসুমপাশে রচি দাও নবীন মিলন-বাঁধন॥' ইহার পরিবর্তে :--

এস' তড়িৎশিখাসম ঝঞ্ঝাচরণে সিন্ধুতরঙ্গ দোলে। / এস' জাগর মুখর প্রভাতে। / এস' নগরে প্রান্তরে বনে। /
এস' কর্মে বচনে মনে। এস' এস'। / এস' মঞ্জীরগুঞ্জর চরণে। / এস' গীতমুখর কলকণ্ঠে।/ এস' মঞ্জুলমল্লিকামাল্যে। / এস' কোমল কিশলয়বসনে। / এস' সুন্দর যৌবনবেগে। / এস' দৃপ্তবীর নবতেজে। /
ওহে দুর্মদ কর' জয়যাত্রা, / চল' জরাপরাভব সমরে / পবনে কেশররেণু ছড়ায়ে, / চঞ্চল কুন্তল উড়ায়ে। /

ভাবে ভাষায় ভঙ্গীতে কী বিস্ময়কর পরিবর্তন বা বিপ্লব তাহা স্বতই প্রতিভাত। তড়িৎ-শিখায়, ঝঞ্ঝাচরণে বা ঝঞ্ঝাবিভঙ্গে, সিন্ধুতরঙ্গদোলে, প্রভাতের জাগরণে ও কর্মে বচনে মনে যে অভেদাঙ্গ-অভেদাত্ম সুন্দরের ও যৌবনদৃপ্ত বীরের আহ্বান, জরাপরাভব সমরে অতি আশ্চর্য তাঁর আচরণ। তাঁর সৌন্দর্য ও মাধুরী, আনন্দ ও উল্লাস (আবেশ নয়)— তাঁর তেজ-বীর্যের পরিপন্থী হইতে পারে না। জরার ছদ্মবেশ ভিন্ন করা ও জড়তার বন্ধনশৃঙ্খল ছিন্ন করা তাঁর বিশেষ লীলা। পুরাতন গানের আধারে সম্পূর্ণ নূতন এই কথা-ও-সুর-সৃষ্টি ফাল্গুনীতে ব্যবহার করা না হইলেও, তাহার সুযোগ আসিল প্রায় দুই দশক পরে। বক্ষ্যমান রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি তথা গীতপঞ্চাশিকা -ধৃত পাঠ হইতে 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'র পাঠে যৎসামান্য প্রভেদ কেবল এই :—

নবপল্লবপুলকিত স্থলে: মধুসৌরভপুলকিত /
এস' স্পন্দিত নন্দিত চিত্তনিলয়ে গানে গানে প্রাণে প্রাণে স্থলে:
আন' বাঁশরিমন্দ্রিত মিলনের রাত্রি, পরিপূর্ণ সুধাপাত্র নিয়ে এস' /
কলকল্লোল তটিনীতীরে স্থলে: এস' নীরবকুঞ্জকুটীরে /

এস' তড়িৎশিখাসম ঝঞ্ঝাচরণে স্থলে: এস' তড়িৎশিখাসম ঝঞ্ঝাবিভঙ্গে / শেষ দৃষ্টান্তের শেষ পদটি ছাড়া সকল পরিবর্তনই যে উজ্জ্বলরসের উজ্জ্বলতাটুকু ফুটাইবার উদ্দেশে তাহা বুঝা যায়। কেননা, ফাল্গুনীর যে বিষয় তাহাতেই সম্মিলিত হইয়াছে এই নূতন নৃত্যনাট্যে বীর্যবান প্রেমেরও উদ্‌গীতি। শেষ পরিবর্তনটি কাব্যগত ছন্দের বিচারেই উৎকৃষ্ট, যেহেতু মাত্রাসম্পূরণের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ ধ্বনিঘাতও সৃষ্টি করে।

বাংলা কবিতার যে কয়টি ইংরেজি রূপান্তর গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই, এমন-কি কোন্ পত্রিকায় প্রকাশিত তাহাও জানা যায় না, এ স্থলে সংকলন করা যাইতেছে—

১২১ ॥ ৫২ ॥

1

There sounded a voice in India's ancient forest proclaiming the presence of a soul in the burning flame, in the flowing water, in the breathing life of all creatures, in the undying spirit of man. Those men who awoke in the world's early surprise of light were strong, fearless and free crossing the barriers of things in joy and meeting the One in the heart of the All.

॥ ৫৩ ॥

2

The time is loud today and crowded, the wealth tinged crimson with the blood of the poor and mind scattered in the wilderness of revolving wheels while the iron demon claims man's soul for its daily food. Come, brave spirits, who can walk unashamed in the path of simple fullness before this huge arrogance of dead things.

॥ ৫৪ ॥

3

Don your white robe, my brothers, and in quiet strength live your life of inner peace. Let your best wealth grow unseen in the heart of your rich leisure and let it crown your forehead with a serene light of joy. Do not bend your knees to the power bloated with grossness, but enthrone your soul upon the freedom of the restrained self.

১২১ ॥ ৫৫ ॥ 4

Let me lay my heart at the feet of those who have sung that Thou art dearer to them than their wealth and children and truer to them than their own selves. Let me seek out that large life of love and strong faith, that perfect flow of moments into the gladness of Thy presence which they had who breathed in the peace of fulfilment in every breath they drew.

১৩১ ॥ ৬৩ ॥

ইংরেজি রচনায় লেখার স্থান কাল প্রায় থাকে না, এটি কোনো-একটি বা কয়েকটি বাংলা রচনার রূপান্তর না'ও হইতে পারে। মৌলিক রচনা বলিয়াই হয়তো তারিখ বসানো হইয়াছে।

The lamp is trimmed.
Comrades, bring your own fire to light it.
For the call comes again to you to join the star pilgrims
crossing the dark to the shrine of sunrise.
The day was when you went forth in your glad adventure of light
and the star of hope thrilled in the sky and kissed your banner.
But as the dusk deepened you fell behind in the march
and slept with your lights gone out
while your dreams grew discordant
like the ominous cries of night birds.
Yet, though it is dark, and the wind in the forest is as
the wails of lost souls,
has not the breath of that prayer already touched your foreheads
which comes from the past echoing from age to age
"Lead me to Light from the dark,
from death to Everlasting Life ?"
Sleepers, arise from your stupor of dim desolation,
and know once more that you are Children of Light.

Jan. 31. 1918

এস এস, বসন্ত, ধরাতলে : গীত-রূপান্তর

রবীন্দ্রনাথ 'মায়ার খেলা'র গান রচনা শুরু করেন দার্জিলিঙে। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, '১২৯৪ সালের শরৎকালে (অক্টোবর ১৮৮৭) রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে দার্জিলিঙে গেলেন।'[১] ছিন্নপত্র[২] গ্রন্থের গ্রন্থপরিচয়ে 'নানা পরোক্ষ প্রমাণ' থেকে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মশাইকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলির রচনাকাল নির্ণয় প্রসঙ্গে দার্জিলিঙের-বিবরণ-সম্বলিত একটি পত্র (সংখ্যা ৭) সূত্রে বলা হয়েছে 'কবি ১৮৮৭ সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি দার্জিলিঙে গিয়াছিলেন সুতরাং অক্টোবরের মাঝামাঝি ফিরিয়া আসার পরে এই চিঠি লেখেন।'

দুই তথ্য মিলিয়ে মোটামুটি ধারণা করা যায় যে, ১৮৮৭ সালের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে 'মায়ার খেলা'র কিছু গান তৈরি হয়। প্রভাত-বাবু লিখেছেন, 'ঠাণ্ডা লাগিয়া কোমরে ব্যথা, উঠিতে পারেন না, শুইয়া গান লেখেন ও সরলা দেবীকে শেখান'।[৩] অসুস্থতাবশতঃ 'মায়ার খেলা'র সবটুকু দার্জিলিঙে তৈরি হয় নি।[৩]

১২৯৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে গীতিনাট্যটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরের মাসের ১৫ তারিখে 'সখীসমিতি'র 'মহিলা শিল্পমেলা'য় এই গীতিনাট্যের প্রথম অভিনয়।[৪]

উপরের তথ্য থেকে ধরা যায়, 'মায়ার খেলা'র 'এস এস বসন্ত ধরাতলে' গানটি ১৮৮৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৮৮ ডিসেম্বরের মধ্যে কোনো সময়ে রচিত। আর-এক ভাবে গানের রচনাকাল সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ১৩৫০ সালের 'গীতবিতান-বার্ষিকী'তে 'গানের ভিতর দেবদর্শন' প্রবন্ধে সরলাদেবী লিখেছেন যে, গাজীপুরে অবস্থান-কালে তাঁরা মামা-ভাগিনেয়ীতে মিলে 'এস এস বসন্ত' গানটিকে 'দ্বি-সুরী' করবার চেষ্টা করেন।

'রবীন্দ্রজীবনী' পড়ে জানতে পাই,[৫] ১২৯৪ সালের শেষ দিকে (১৮৮৮) রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে গাজীপুরে বাস করতে মনস্থ করেন। সেখান থেকে অন্তত দুবার কলকাতা যাওয়া-আসা করেছেন, এবং 'শ্রাবণ মাসে ন-দিদি স্বর্ণকুমারীকে' গাজীপুরে নিয়ে গেছেন। অর্থাৎ ১২৯৫'এর শ্রাবণ (সম্ভবতঃ জুলাই ১৮৮৮) মাসে সরলাদেবী মাতা স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে গাজীপুরে বেড়াতে গিয়েছিলেন। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের অনুমান, 'বর্ষার শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে' কলকাতায় ফেরেন। এ থেকে মনে করা অসঙ্গত নয় যে, ১২৯৫'এর শ্রাবণ মাসের মধ্যেই 'এস এস বসন্ত' গানের 'দ্বি-সুরী' গীতরূপ তৈরী হয়েছিল।

এইভাবে আলোচনা ক'রে মনে হয়, নভেম্বর-ডিসেম্বরে নয়, জুলাই-আগস্টেই 'মায়ার খেলা'র 'এস এস বসন্ত' গানটির রচনা হ'য়ে গিয়ে থাকবে।

গাজীপুরে পাশ্চাত্যসংগীতে সুশিক্ষিতা সরলাদেবীর সহায়তায় রবীন্দ্রনাথ 'এস এস বসন্ত ধরাতলে' গানটির যে 'দ্বি-সুরী' (harmonised) সুর তৈরি করেন, তার স্বরলিপি প্রকাশিত হয় ১৩৩২ সালের আষাঢ়ে মুদ্রিত 'মায়ার খেলা'য় (বর্তমানে স্বরবিতান-৪৮)। এর স্বরলিপি লেখেন ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী।

অধুনা প্রচলিত 'এস এস বসন্ত' গানের কথার সঙ্গে যেমন, সুরের সঙ্গে তেমনি 'মায়ার খেলা'র গানটির প্রভেদ আছে। ১২৯৫ সালে রচিত গানটি এখন আর কেউ গায় না।

প্রভাত মুখোপাধ্যায় মশাই তাঁর 'গীতবিতান/কালানুক্রমিক সূচী' গ্রন্থে যেমন বলেছেন, এ গান তেমন 'স্ত্রীগণের গান' মাত্র ছিল না। কি 'রবীন্দ্ররচনাবলী' (বিশ্বভারতী) প্রথমখণ্ডে কি 'মায়ার খেলা'র স্বরলিপিতে দেখা যায়, এ গান 'স্ত্রীগণ' ও 'পুরুষগণ' উভয় দলেরই গেয়। স্বরলিপিতে কোনো কোনো অংশ আবার 'ঐক্য তানে গেয়' ব'লে দেখানো হয়েছে। স্বরলিপিতে স্ত্রী ও পুরুষের অংশ যেভাবে সম্পূর্ণ নির্দেশ করা আছে, গীতিনাট্যের পাঠ্যরূপে সেভাবে দেখানো সম্ভব নয়। সুরে গানটি এমন পাল্টাপাল্টি ক'রে গাইবার নির্দেশ দেওয়া রয়েছে, যা কথায় স্ত্রীগণ বা পুরুষগণের নামে আলাদা ক'রে দেখাতে গেলে স্বচ্ছন্দ পাঠের বাধা হবে।

'মায়ার খেলা'র এই গানটির কোনো কোনো অংশ দুই দল একই সঙ্গে দুই সুরে গাইবে বলা আছে। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যের অভিনয়ে যাঁরা অংশগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী অমিয়া ঠাকুর এখনো আমাদের মধ্যে রয়েছেন। এ গান সত্যি সত্যি হার্মোনাইজ ক'রে, এবং বর্তমানে প্রচলিত 'এস এস বসন্তে'র মত লয়-ফেরতা ক'রে, গাওয়া হত কিনা এই বিষয়ে শ্রীমতী অমিয়া ঠাকুরকে প্রশ্ন করলে পত্রোত্তরে তিনি প্রাসঙ্গিক যা জানান, তা এখানে তুলে দিচ্ছি—

'...আমরা যখন মায়ার খেলা করেছিলাম তখন নৃত্যনাট্য না হলেও প্রত্যেক গানটি তার নিজের লয়ের সঙ্গেই এমন ভাবে গাওয়া হত— যেন নাচের ভঙ্গিই তার মধ্যে ছিল। বিশেষ করে 'এস এস বসন্ত' গানটী সমস্তটাই লয়ের সঙ্গে গাওয়া হয়েছিল।— খানিকটা নাচের মধ্যে দিয়ে বরণের মত ভাবে। আজ ৫০ বছর হতে চল্ল[৬]— যেটুকু মনে পড়ছে তোমাকে জানাচ্ছি।— ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীর স্বরলিপিতে যেমন আছে তুমি লিখেছ, আমরা সেই-রকমই শিখেছিলাম। আমরা যখন করেছিলাম— ইন্দিরা পিসি আর সরলা পিসি দুজনেই ছিলেন। আমরা, ওঁরা যেমন শিখিয়েছিলেন সেইমতই শিখেছিলাম। হারমোনাইজেসন যেমন আছে সেইভাবেই গাওয়া হয়েছিল। 'এস থরথর কম্পিত' ঐ ভাগটা যেমন লিখেছ তেমনই গাওয়া হয়েছিল— খাদে এবং চড়ায়।—

'হ্যা ওই গানটির খানিকটা অংশ কখনও ধীর লয় এবং কখনও দ্রুত লয়ে গাওয়া হয়েছিল কিন্তু সব সময় লয়টি ছিল তার মধ্যে।— সরলা পিসিই ত— আমাদের সঙ্গে পিয়ানোতে কর্ড দিয়ে বাজিয়েছিলেন আর ইন্দিরা পিসি অর্গান। কাজেই আমাদের সময় যা গাওয়া হয়েছিল তা হয়ত ভবিষ্যতে আর হবে না কারণ তাঁরা দুজনেই আজ নেই। সে জিনিষ তোমরা ঠিক কল্পনা করতে পারবে না— নৃত্যনাট্যে সে জিনিষ ঠিক আসে না কারণ— আমরা প্রত্যেকেই নিজের গান করেছিলাম অভিনয়ের সঙ্গে।'

১৩২৫ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত 'গীতপঞ্চাশিকা' স্বরলিপিতে এ গানের যে পাঠান্তর

এবং সুরান্তর পাওয়া যায়, পরবর্তী কালে সেই সুর-বাণীই অধিক প্রচারিত হওয়ায়, 'মায়ার খেলা'র 'দু-সুরী' গানটির কথা এ যুগে অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

'গীতপঞ্চাশিকা'র পাঠ থেকে প্রেমের আবিষ্টভাবটি মোচন ক'রে দৃপ্তযৌবনের ভাব আনবার সঙ্গে সঙ্গে সুরেও পরিবর্তন এসেছে। 'গীতপঞ্চাশিকা'র গানগুলি রচিত হয় আনুমানিক ভাদ্র ১৩২২ থেকে মাঘ ১৩২৪'এর মধ্যে।[৭] ঐ সময়ে— 'ফাল্গুনী' নাটকে বসন্তোৎসবের বাণীতে 'আপনাকে এই দখিন হাওয়ায় ছড়িয়ে দে রে দিগন্তে' বলে যে আনন্দোচ্ছল আহ্বান আছে, তারই সঙ্গে মিলিয়ে 'এস এস বসন্ত' গানটিতেও বাণী ও সুরের নতুন বিন্যাস হয়েছিল এরূপ অনুমান করা চলে। কিন্তু খেয়ালী রচয়িতা শেষ পর্যন্ত গানটিকে 'ফাল্গুনী' নাটকের অঙ্গীভূত করেন নি।

'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'[৮]তে যখন আবার 'এস এস বসন্ত'কে বিন্যাস করা হল, তখন সে নাটকে প্রেমের প্রসঙ্গ থাকলেও গানটিকে আদিরূপে ফিরিয়ে না নিয়ে 'গীতপঞ্চাশিকা'র রূপের প্রায় কাছাকাছি রাখা হল। প্রেমে বীর্য আছে এই নৃত্যনাট্যে। প্রেমের প্রসঙ্গ আনবার জন্য এবং প্রাসঙ্গিক অন্য কারণে মাত্র চারটি জায়গাতে ভাষা বদল করা হয়েছে। কিন্তু, সুরে তেমন তফাত হয় নি। স্পর্শসুর ব্যবহারেই যা-কিছু ভেদ দেখা যায়, তা স্বরলিপিকার-ভেদে দেখা দিয়েছে বলে ধরা অন্যায় হবে না। আগেই বলেছি, 'মায়ার খেলা'র স্বরলিপি করেছেন ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী, 'গীতপঞ্চাশিকা' দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'— শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার।

'মায়ার খেলা'র গানটির সঙ্গে 'গীতপঞ্চাশিকা' এবং 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'র সুরেরই বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। 'মায়ার খেলা'র সুরের সঙ্গে 'গীতপঞ্চাশিকা'র সুরের ভেদই এখন বিশেষ আলোচনার বিষয়।

'মায়ার খেলা'র গানটিতে অনেক জায়গায় একই পংক্তি পর পর দুই সুরে বিন্যস্ত হয়েছে। তাই, গানের পদের দৈর্ঘ্য-বিচারে 'মায়ার খেলা'র গানটি অনেক ছোটো হওয়া সত্ত্বেও দুই গানের স্বরলিপি বিস্তারে প্রায় সমান।

'গীতপঞ্চাশিকা'র 'আন নব উল্লাসহিল্লোল।
আন আন আনন্দছন্দের হিন্দোল'

অংশের সুর 'মায়ার খেলা'র 'আন নবযৌবনহিল্লোল, নব প্রাণ,
প্রফুল্ল প্রাণের বাসনা' অংশের

প্রথম সুরের মত। আবার 'গীতপঞ্চাশিকা'র
'ভাঙ ভাঙ বন্ধনশৃঙ্খল
আন আন উদ্দীপ্ত প্রাণের বেদনা' পদে রয়েছে 'মায়ার খেলা'র উল্লিখিত অংশের দ্বিতীয় সুরটি। 'মায়ার খেলা'র গানটির শেষ স্তবক

'এস যৌবনকাতর হৃদয়ে,

এস মিলনসুখালস নয়নে ;
এস মধুর শরম-মাঝারে' অংশের প্রথম সুরের সঙ্গে
'গীতপঞ্চাশিকা'র 'এস মঞ্জীরগুঞ্জর চরণে। এস গীতমুখর কলকণ্ঠে।
এস মঞ্জুল মল্লিকামাল্যে' বেশ মেলে।

কেবল 'মিলনসুখালস নয়নে'র সঙ্গে 'গীতমুখর কলকণ্ঠে'র এবং 'এস মধুর শরম-মাঝারে'র সঙ্গে 'ওহে দুর্মদ কর জয়যাত্রা'র ভেদ এসেছে স্বাভাবিক নিয়মে, অর্থাৎ প্রসঙ্গের অনুসরণে সুর যোজনা করা হয়েছে ব'লে। 'সুখালসে'র ভাবের চাইতে 'গীতমুখর কলকণ্ঠে'র সুর স্বভাবতই চঞ্চল হবে—

'পা দা I পা পা পমা পা | পণা -দা পা পদা |
এ স মি ল ন• সু খা০ • ল স•

মা পা মজ্ঞা -া' এবং 'র্সা র্সা I র্সণা -
ন য় নে • এ স গী

দা দা | দা পা পমা পা I পণা -দপা মজ্ঞা -া'
ত মু খ র ক০ ল ক• •ণ্ ঠে• •

'মধুর শরম' এবং 'জয়যাত্রা' দুই ধরনের ব্যাপার, তাই প্রথম বাক্যাংশের সুর যেমন শান্ত, পরের অংশের সুর সেরকম নয়। তুলনীয় অংশের স্বরলিপি এই—

'মপা জ্ঞা জ্ঞা ঋা | সা সণ্‌া সা -ঋা |
ম০ ধু র শ র ম০ মা •

জ্ঞাঃ -ঋঃ জ্ঞা -া' এবং 'ধর্সা র্সা I
ঝা • রে ০ ও০ হে

ধণা -ধণা পমা পা | মজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা মা I
দু• •র্ ম• দ ক র জ য়

ঋা -া সা -া'।
যা ০ ত্রা •

বাঁধি, / নবীন কুসুমপাশে রচি দাও নবীন মিলনবাঁধন' পর্যন্ত অংশের সুরেই, মোটামুটি, 'গীতপঞ্চাশিকা'র গানের 'এস সুন্দর যৌবনবেগে। এস দৃপ্ত বীর, নব তেজে।

ওহে দুর্মদ, কর জয়যাত্রা— চল জরাপরাভব সমরে
পবনে কেশররেণু ছড়ায়ে— চঞ্চল কুন্তল উড়ায়ে'

অংশের সুর বাঁধা রয়েছে। তুলনীয় অংশ দুটির মধ্যে প্রধান ভেদ 'দাও বাহুতে বাহু বাঁধি'র সঙ্গে 'চল জরাপরাভব সমরে' বাক্যাংশের ভাবের। 'বাহু' বলতে কারুকার্য ব্যবহার ক'রে এবং 'পরাভব' উচ্চারণে সুরের ঋজুগতি বজায় রেখে, সুরেও ভাবানুগত পার্থক্য দেখানো হয়েছে।—

'সা	-মা	I
দা	ও	

মা	-া	মা	মা |	পা	-ধপা	-মপা	গা'	এবং
বা	•	হু	তে	বা	••	••	হু	

'সা	সা I	সা	সা	-মা	মা |	মপা	-া	পমা	গা'।
চ	ল	জ	রা	•	প	রা•	•	ভ	ব

আগে তৈরি-করা গানটির 'এস থরথর কম্পিত, মর্মরমুখরিত, নবপল্লবপুলকিত, / ফুল-আকুল-মালতীবল্লী-বিতানে' অংশের দুই সুর একই সঙ্গে পর পর সাজিয়ে, পাদটীকায় বলা হয়েছে 'ঐক্যতানে গেয়'। '১' নম্বর-দেওয়া সুর স্ত্রীকণ্ঠে, '২' নম্বর-দেওয়া সুর পুরুষকণ্ঠে গাইবার নির্দেশ দেওয়া আছে এই গানের স্বরলিপির প্রথম পৃষ্ঠার নীচে। দুই সুরে 'ঐক্যতান' বলতে, স্বরসঙ্গতি বা হার্মোনাইজেশনের নিদর্শন রয়েছে এইখানেই।

'গীতপঞ্চাশিকা'র— 'এস থরথর-কম্পিত, মর্মর-মুখরিত, নব-পল্লব-পুলকিত, ফুল-আকুল-মালতীবল্লী-বিতানে' পর্যন্ত কথার সুর প্রথমরচিত গানটির পুরুষকণ্ঠে গেয় সুরে বাঁধা। আর, 'মায়ার খেলা'র স্ত্রীকণ্ঠে গেয় সুরটি পাওয়া যাচ্ছে 'গীতপঞ্চাশিকা'র 'এস বিকশিত উন্মুখ, এস চির-উৎসুক নন্দনপথ-চির-যাত্রী। / এস স্পন্দিত নন্দিত চিত্তনিলয়ে' অংশে। এখানে দুটি অংশের সুরে কিছু পার্থক্য আছে। মনে হয়, প্রথম গানে স্বরসঙ্গতি আনবার প্রয়োজনে সুর যেরকম রাখতে হয়েছিল, স্বতন্ত্রভাবে বিন্যাসের সময়ে তার দরকার হয় নি ব'লে সুর কিছু স্বাধীনতা পেয়েছে। পুরুষকণ্ঠে গেয় সুরে একটু আড়ষ্টতা ছিল[৯], স্বতন্ত্র বিন্যাসে সে দোষ মোচন হয়েছে। স্বরসঙ্গতির জন্য আরম্ভে মুদারা ও তারার স্বরের সঙ্গে উদারা ও মুদারার স্বর কেমন মিলিয়ে সাজানো হয়েছে, স্বরলিপি দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে।—

'ধা না I না র্সা র্সা র্সা | র্সা -া র্সা র্সা | না -র্সা
সা সা I ন্‌া সা সা সা | সা -া সা সা | সঋা -া
এ স থ র থ র ক ম্‌ পি ত ম র্‌

র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা র্সা'।
ঋা ঋা | সা সা সা সা
ম র মু খ রি ত

কিন্তু পরবর্তী গানে'এস থরথর-কম্পিত' এরকম : 'সা সা I সা ঋা ঋা ঋা
এ স থ র থ র

| ঋা -া ঋা ঋা I ঋা -া ঋা ঋা | ঋা ঋা সা সা'।
ক ম্‌ পি ত ম র্‌ ম র মু খ রি ত

'গীতপঞ্চাশিকা'র 'এস এস বসন্ত' গানের পদে যেসব পংক্তি পরে সংযোজিত, তার অনেকগুলির সুর 'মায়ার খেলা'র গানে পূর্বোক্তভাবে থেকে গেলেও চারটি অংশের সুর পরবর্তী গানে নতুন সংযোজন। উক্ত চারটি অংশ এই— 'আন বিশ্বের অন্তরে অন্তরে নিবিড় চেতনা', 'গানে গানে প্রাণে প্রাণে এস এস', 'এস তড়িৎ-শিখা-সম ঝঞ্ঝাচরণে সিন্ধু-তরঙ্গদোলে। / এস জাগর মুখর প্রভাতে। এস নগরে প্রান্তরে বনে। / এস কর্মে বচনে মনে। এস এস' এবং 'এস কোমল কিশলয়-বসনে'। এর মধ্যে প্রথম তিনটি অংশে, বসন্তে প্রকৃতির নবজীবনের সঙ্গে মানবের প্রাণের উজ্জীবন এবং জীবনে সর্বতোভাবে বসন্তের প্রেরণা গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। এ ভাব 'মায়ার খেলা'তে ছিল না ব'লেই গানটির নবরূপায়ণে এর বাণীতে নতুন ভাবে সুরারোপের প্রয়োজন হয়েছে।

'এস কোমল কিশলয়বসনে' পংক্তিটির পূর্ববর্তী 'এস মঞ্জুল মল্লিকামাল্যে' পর্যন্ত অংশের সুর 'মায়ার খেলা'র 'এস মিলনসুখালস নয়নে' র দ্বিতীয় সুরে রয়েছে। তার পরেই শুরু হচ্ছে 'মায়ার খেলা'র 'এস যৌবনকাতর হৃদয়ে', পরবর্তী গানের 'এস সুন্দর যৌবনবেগে'র মত সুরে। এইখানে দুই পংক্তির সংযোগস্থলে সুরে স্বাভাবিক মিলনের ভাব আসে না। আগের অংশ শেষ হচ্ছে কোমল গান্ধারে, পরের অংশ শুরু হচ্ছে শুদ্ধ ধৈবত থেকে। মনে হয় এই ব্যবধান লোপ করবার জন্যই দ্বিতীয় গানে এখানে 'এস কোমল কিশলয়বসনে' যোগ করা হয়েছে। কোমল গান্ধারের পর ষড়্‌জ থেকে শুরু ক'রে ক্রমে শুদ্ধ ধৈবতে পৌঁছানোর ফলে পরবর্তী ধৈবত সুরের ধরতা স্বাভাবিক হয়েছে। দ্বিতীয় গানটিতে কোমল গান্ধার এবং শুদ্ধ ধৈবতের ফাঁক-ভরাট-করা প্রাসঙ্গিক অংশের স্বরলিপিটুকু এখানে লিপিবদ্ধ করছি—

'মা পা I পমা -জ্ঞা জ্ঞা ঋা |
এ স ম ন্‌ জু ল

সা -ণা সা ঋা I জ্ঞা -ঋা মজ্ঞা -া | -া -া সা ঋা
ম ল্ লি কা মা ল্ লে • • ০ এ স

I সা -মা মা মা | মপা পা মা গা I মা ধপা ধা
কো • ম ল কি শ ল য় ব স• নে

-া | -া -া ধা না' ইত্যাদি।
• • ০ এ স

দ্বিতীয় গানে আগের কিছু সুর পরিবর্জিতও হয়েছে। পুরুষকণ্ঠে গেয় সুর 'আন কুহুতান প্রেমগান' ও 'আন গন্ধমদভরে অলস সমীরণ' এবং স্ত্রীকণ্ঠে প্রথমবার গেয় 'কমলবরণ তরুণ উষার কোলে / এস জ্যোৎস্নাবিবশ নিশীথে, কলকল্লোল তটিনীতীরে, / সুখসুপ্ত সরসী-নীরে এস' —'গীতপঞ্চাশিকা'র গানে বর্জিত।

এ ছাড়াও দু-এক জায়গায় স্বরব্যবহারে পার্থক্য ঘটেছে দুটি গানে। প্রথম গানের দ্বিতীয় 'এস জ্যোৎস্না'র সুর এরকম— 'পা মা I গা -ঋা সাঃ -ণঃ'
এ স জ্যো ৎ স্না •

পরের গানে— 'সা সা I গঋা -া ঋা -া'। কোমল
এ স জ্যো ৎ স্না •

এবং শুদ্ধস্বরের ভেদ পাওয়া যায় দুই গানের 'মধুবায়ে' এবং প্রথম গানের 'নবীনকুসুমপাশে'র 'নবীন' ও দ্বিতীয় গানের 'পবনে'তে। 'মায়ার খেলা'র 'মধুবায়ে' এরকম—

'র্সা ঋা | র্সঋা -জ্ঞা জ্ঞা -ঋা | -র্সা -া'
ম ধু বা• • য়ে • • •

'গীতপঞ্চাশিকা'র— 'র্সা ঋা | ঋা -র্গা র্গা -ঋা I
ম ধু বা • য়ে •

ঋর্সা -া'। 'নবীন'— 'ধা -ণা র্সা -র্গা
• • ন • বী •

| র্গা -া'। 'পবনে'— 'ধা -না র্সা -র্গা |
ন • প • ব •

সব-শেষে তালের প্রসঙ্গ। 'মায়ার খেলা'র গানটিতে ষোলো মাত্রা পর পর সমের দণ্ড রয়েছে, 'গীতপঞ্চাশিকা'য় আট মাত্রার পরে। 'গীতপঞ্চাশিকা'র গানটি গাওয়া হয় কখনো

ধীরে কখনো দ্রুত লয়ে। এই ছন্দ-পরিবর্তনে 'চিত্রাঙ্গদা'য় নৃত্যসঙ্গতের হিসেবে এই গানটি প্রাণবন্ত হয়েছে। প্রথমে রচিত গীতিনাট্যের গানটিও লয়-ফেরতা। তদুপরি, কখনো পুরুষ কখনো স্ত্রীকণ্ঠে কখনো সম্মিলিত ভাবে গীত হ'য়ে আরো বৈচিত্র্যমধুর হয়েছে। সেখানে ত্রিতালের চাল কোনো বাধা হয় নি। ষোলো মাত্রার তাল বজায় রাখবার জন্য দুই জায়গাতে সুর টেনে রাখতে হয়েছে। দ্বিতীয় গানটির সঙ্গে সেখানে ভেদ হয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বাণীর সঙ্গে সেই বিরাম সুসঙ্গত হয়ে ভাবকে স্ফূর্তি দিয়েছে। 'সুখসুপ্ত সরসীনীরে এস এস' ব'লে বারো মাত্রা সময় সুর ধ'রে রাখাতে আহ্বানের ভাব জোর পেয়েছে। 'রচি দাও' প্রার্থনার পরে আট মাত্রা সময় সুর ধ'রে রাখাতেও ঈপ্সিত ভাব প্রকাশিত হয়েছে। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় গানটির শেষে 'এস' আহ্বানের আবেদন প্রকাশ ক'রে সুর ধ'রে রাখা হয়েছে ছয় মাত্রা সময়। প্রথম গানে এই বিরাম নেই।

রবীন্দ্রসংগীতের অন্যান্য পদান্তর বা সুরান্তরের চেয়ে 'এসো এসো বসন্ত ধরাতলে' গানটির পদান্তর এবং সুরান্তর অনেক বেশী কৌতূহলোদ্দীপক। সুরের বহু মিল সত্ত্বেও, বক্তব্যের পার্থক্যে এবং সেই বক্তব্যের সঙ্গে সুরের সুষম মিলনে সামগ্রিক ভাবে প্রথম গানটি যদি আমাদের 'রঙিন-কুহকে-আচ্ছন্ন মায়াময় ভুবনে'র খবর দেয়, তবে দ্বিতীয়টি আলোকোজ্জ্বল চেতনাদীপ্ত আনন্দছন্দে প্রাণে উদ্দীপনা আনে। ডিসেম্বর ১৯৭৭

শ্রীমতী সন্‌জীদা খাতুন

উত্তরটীকা

১ 'রবীন্দ্রজীবনী' প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৭০, পৃ. ২৫৫

২ নূতন সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৭৫ বা ১৩৮২, পৃ. ২৯৫

৩ প্রাগুক্ত রবীন্দ্রজীবনী, পৃ. ২৫৬

৪ তদেব পৃ. ২৬৯-৭০

৫ তদেব, পৃ. ২৫৯, ২৬৭

৬ কলকাতা হতে শান্তিনিকেতনে ডাকযোগে প্রেরিত বে-তারিখ এই পত্রের উপরে শান্তিনিকেতন ডাকঘরের তারিখ— অক্টোবর ১৯৭৬

৭ শান্তিনিকেতনে 'রবীন্দ্রভবন' সংগ্রহে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ১১১-সংখ্যক রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির বিশদ বিবরণ রবীন্দ্রবীক্ষার এই সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

৮ '১৯৩৬ (১৩৪২-৪৩॥ ১৮৫৭-৫৮ শক)— বয়স ৭৫।... ফেব্রুয়ারি ১৪... 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য রচনা।... মার্চ ১১, ১২, ১৩— কলিকাতায় নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য অভিনীত।'— শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জী, পৃ. ১৩৪

৯ 'গা গা I মা -া পা ্পা | দা -া পা পা | দা -া পা মা |
ফু ল আ ॰ কু ল মা ॰ ল তী ব ল্ লী বি

মপা -মা গা -া'।
তা॰ ॰ নে ॰

বঙ্কিম-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ সম্প্রতি 'বঙ্কিমচন্দ্র' বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবিধ রচনার একটি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন; তার এক অংশে 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ' নামে বিভিন্ন সূত্রে রবীন্দ্রনাথের বঙ্কিমচন্দ্র-সম্বন্ধীয় যে মন্তব্যাদি আহৃত হয়েছে, রবীন্দ্রবীক্ষার তৃতীয় খণ্ডে তার আরো কয়েকটি মূল্যবান পরিপূরণ লক্ষ্য করা গেল।* 'বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে শেষ রবীন্দ্ররচনারূপে গৃহীত হয়েছে একটি 'ভাষণ', 'বঙ্কিম জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ৬ আগস্ট ১৯৩৮ সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনে কবি যে বক্তৃতা করেন' ২৪ শ্রাবণ ১৩৪৫ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সেই বক্তৃতার ক্ষিতিমোহন সেন-অনুলিখিত পাঠ উক্ত 'ভাষণ'। পুরোনো কাগজের বিস্মৃতি থেকে উদ্ধার করে সংকলয়িতা রবীন্দ্রজিজ্ঞাসুজনের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

এই 'ভাষণে'র উপলক্ষে আর-একটি ভাষণের কথা উল্লেখ করি। ৮ই ও ৯ই আষাঢ়, ইংরেজি ২৩-২৪ জুন, ১৯২৩, শনি ও রবিবার, নৈহাটিতে বঙ্গীয় চতুর্দশ-সাহিত্য-সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। এই বছরের সম্মিলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বঙ্কিমস্মৃতি-উদ্‌যাপন, স্থানকুণ্ঠাবশত বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়ার বাসভবনের পরিবর্তে নৈহাটিতে সভাপরিসর স্থাপন করা হয়। ১২ আষাঢ় ১৩৩০, ইং ২৭ জুন ১৯২৩ বুধবারের আনন্দবাজার পত্রিকার 'যৎকিঞ্চিৎ'-স্তম্ভে এই বিবরণ প্রকাশিত হয়—

> এবারকার সম্মিলনীর আর এক বিশেষত্ব রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা। সৌম্যকান্তি, পক্ককেশ রবীন্দ্রনাথ যখন বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন সভাগৃহ মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেন যে নব্যবাংলা সাহিত্যের ভগীরথ বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশে অর্ঘ্য দিতেই নৈহাটী সম্মিলনে আসিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলার গ্রাম্য-সাহিত্যের ভাষাকে বিশ্ব-সাহিত্যের উপকরণরূপে গড়িয়াছেন, টোলের পণ্ডিত ও কর্মীনবিশেরা তাঁহাকে যে সমস্ত শৃঙ্খল পরাইয়াছেন, তাহা স্বহস্তে মোচন করিয়া তিনি বাঙ্গলা ভাষাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি কেবল সাহিত্যের বিজয়যাত্রার পথই তৈরী করেন নাই, রথও নিজে গড়িয়াছিলেন। তখনকার দিনে সে যে কত বড় কৃতিত্ব তাহা আধুনিকেরা বুঝিতে পারিবেন না। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলা-সাহিত্যের শৈশবে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন তাহাই আজ অরণ্যকে বহন করিয়া আনিয়াছে। অতএব বঙ্কিমের নিকট বাঙ্গলা-সাহিত্যের ঋণের পরিমাণ করা যায় না।

পূর্ব দিনের, ১১ আষাঢ় ১৩৩০, ইং ২৬ জুন ১৯২৩ মঙ্গলবারের পত্রিকায় সম্মিলনের প্রথম দিনের অধিবেশনের সংবাদে প্রকাশ[১]—

> অপরাহ্ণ প্রায় ৩টার সময় রবীন্দ্রনাথ আসিয়া সভার গৌরব বর্ধন করেন।…
>
> …রবীন্দ্রনাথ সভাস্থলে পদার্পণ করিলে, তাঁহাকে সমুচিত অভ্যর্থনা করা হয়। সভাপতির

বিশেষ অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ অতি মনোহর কবিত্বপূর্ণ ভাষায় নবযুগের সাহিত্য ও বঙ্কিম-চন্দ্র সম্বন্ধে দু-একটী কথা বলেন। বক্তৃতা স্বল্পকালব্যাপী হইলেও সমস্ত সভা মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহা শুনিয়াছিল।

বঙ্গীয় চতুর্দশ-সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য-বিবরণী পুস্তক থেকে সভামঞ্চে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি ও ভাষণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ পাওয়া যায়—

১ অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মিত্র বাহাদুর তাঁর অভিভাষণের মধ্যে উল্লেখ করেন: 'আমাদের পরম আনন্দের বিষয় যে, জগৎপূজ্য কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই সভায় উপস্থিত হয়ে এই সভার গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর বিষয়ে আমার কিছু বলবার চেষ্টা করা ধৃষ্টতা মাত্র। তিনি এই সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্‌বোধয়িতা[২] এবং বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম প্রিয়পাত্র। তাঁহার উপস্থিতি বঙ্কিম-পূজার সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য।'

২ প্রথম দিনের অধিবেশনের ১৮ সংখ্য বিষয়সূচীতে উল্লেখ পাওয়া যায়: 'ইতিহাস-শাখার সভাপতি ডাঃ কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পড়িতে আরম্ভ করিবার পর, কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। সমবেত জনমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি করিয়া তাঁহাকে সংবর্ধনা করিলেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে মাল্যদান করিলেন। তৎপরে ইতিহাস-শাখার সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণ পাঠ করিয়া শেষ করেন।'

৩ নরেন্দ্রনাথ লাহার অভিভাষণের পর যূথকণ্ঠে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আমার ভাষা' গানটি গীত হয়। ২০ সংখ্য বিষয়সূচীতে দেখা যায়: 'তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিম্নলিখিত বক্তৃতাটি করিলেন··· '

রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাটি বিদ্যাদিত্য শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী লিপিবদ্ধ করেছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক অনুলিখিত ভাষণের সেই পাঠ কার্য-বিবরণী পুস্তকের প্রথম ভাগ থেকে আদ্যোপান্ত উদ্‌ধৃত করে দিলাম।—

ভাষণ

আমি আজকে এই সভাতে আসবার জন্য আমাদের পরমশ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আমন্ত্রণ-পত্র পেয়েছিলুম। আপনারা অনেকে জানেন, আমি স্বভাবতঃ সভাভীরু লোক; পারতপক্ষে সভায় যেতে স্বীকার করি না। এখন শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা ক্ষীণ হয়েছে; যেটুকু বাকী আছে, মনে করি সেটুকুর আর অপব্যয় করব না। এই জন্যই সাধারণ সভায় যাওয়া বন্ধ করেছি। আমি তাঁহার আহ্বান দ্বিধার সহিত স্বীকার করেছি। তবে এবার বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থানে যখন সম্মিলন হয়েছে, তখন তাঁহার প্রতি যদি আমার সম্মান-অর্ঘ্য দিতে পারি, তার জন্য এসেছি। শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে পূর্বেই অভয়

দিয়েছিলেন যে, আমাকে বক্তৃতা করতে দিবেন না ; কাজে কিন্তু তাহা হল না। আমার যা শিক্ষা হল ভবিষ্যতে স্মরণ করব।

আমি কী আর বলব। আমি অপ্রস্তুত, অনেকে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। অনেকে বলেছেন, অনেকে বলবেন। তবে এখানে সভ্য যাঁরা আছেন, তাঁদের চাইতে আমার অধিকার আছে। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা দেশে বাঙলা সাহিত্যে ও ভাষায় নূতন প্রাণের ধারা দিয়েছিলেন। যখন 'বঙ্গদর্শন' প্রথম বাহির হয়েছিল, তখন আমি যুবা বা তার চাইতেও কম বয়সের ; আমি প্রাণের সেই স্বাদ পেয়েছিলুম। বাঙলা ভাষা এখন অনেক পরিপূর্ণ ; তখন নিতান্ত অল্পপরিসর ছিল। একলাই তিনি একশ ছিলেন। দর্শন, বিজ্ঞান, নভেল, সমালোচনা, কথা প্রভৃতি সকল দিকেই তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। সে যে কত বড় কৃতিত্ব, এখন ভালো করে তাহা উপলব্ধি করা কঠিন। বাঙলা ভাষা পূর্বে বড় নিস্তেজ ছিল ; তিনি একাই একে সতেজ করে গড়ে তুলেছিলেন।

আগে আগে 'জয়দেব' প্রভৃতির এবং 'বেণীসংহারে'র ছাঁদে সংস্কৃত ভাষারই বিস্তার হয়েছিল। সর্বভারতে ভাব দান করতে হলে গ্রাম্য বা প্রাদেশিক ভাষা চলে না, এই বিশ্বাসে প্রাদেশিক বাধা অতিক্রম করবার চেষ্টা না করে তখন সকলে ভাব দানাদান করতেন। ভাব-সম্পদ দিতে গেলেই তাঁহারা তখন সংস্কৃত ভাষার ভিতর দিয়ে যেতেন। কিন্তু এই বাঙলা ভাষা তখন গ্রামের পরিধিকে অতিক্রম করে নাই ; গ্রামের মধ্যেই বদ্ধ ছিল। বাঙলা ভাষার প্রতি লোকের সেকালে সে পরিমাণ শ্রদ্ধা ছিল না। শ্রদ্ধা না থাকিলেই দুর্ঘটনা, দৈন্য ; তখন তাহাই হয়েছিল। আমরা আমাদের ভাষা দ্বারা যদি হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করতে না পারি, তবে নিজকে বিলুপ্ত করে থাকতে হয়। যতদিন সেই শ্রদ্ধা আকর্ষণ না হয়েছিল, ততদিন আপনার উপলব্ধি কী [?] পরের কাছে পরিচয় দিতে পারি নাই। এখন আমরা তাহা বুঝি না, কিন্তু কী পরিশ্রম ও উদ্যমের ফলে তাহা হয়েছিল— কী প্রতিভার বলে বঙ্কিমচন্দ্র তাহা করেছিলেন, এখন তাহার কল্পনা করা যায় না। সেই প্রথম দিনে তিনি একলা ছিলেন ; পরে আরও দু-চার জন হয়েছিলেন। ভাষার শুচিতার জন্য তাঁহারা কী করেছিলেন সে ইতিহাস এখন বিলুপ্ত। বিরুদ্ধতা ও বিদ্রূপ কত হয়েছিল, তিনি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। একাই সব্যসাচী ছিলেন। সাহিত্যকে তিনি নানা রূপে বিচিত্র ভাবে গড়ে তুলেছিলেন— এটা কম আশ্চর্য নহে। আমরা তাঁহার দ্বারা কত উপকৃত, তাহা বলে শেষ করা যায় না। আধুনিক যুগের যা-কিছু বাণী, সমস্ত আমাদের ভাষায় প্রকাশ করা বড় সাহস। তখন লোকে তাহা মনেই করতে পারত না। বিজ্ঞান সাহিত্য ইতিহাস যে বাঙলায় হয়, এটা তখন আশ্চর্যের বিষয় ছিল ; কাজেই তখনকার কবিতাও ইংরেজীতে হইত। বাঙলা ভাষা ও বাঙালী জাতি তখন এই ভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল— বঙ্কিমচন্দ্র সেই জাতীয় ধ্বংসের প্রতিরোধ করেন। তাঁর সেই কাজটা কত বড়, আপনারা ভেবে দেখবেন।

তিনি ভাষার প্রথম বন্ধন মোচন করেন এবং ভগীরথের মত বহু দূর পর্যন্ত ভাগীরথীর

প্রবাহ প্রবাহিত করেন। তাঁহারই কৃপায় আমরা আজ এই বর্তমান আকারের ভাষা পেয়েছি। আমি ভাষার জন্ত নিজেও যেটুকু চেষ্টা করেছি, তাও তাঁহারই কৃপায়। আমি যে আজ এসেছি তাহার কারণ, আমার সেই আন্তরিক শ্রদ্ধা আজ সকলের সম্মুখে জানালাম। আমি যে তাঁহার কাছে কত ঋণী তাহা স্বীকার করলাম। তিনি যে অস্ত্র ও উপকরণ নিয়ে কাজ করেছিলেন তাহা বড় কম-জোর ছিল; তখনও ভাষায় শক্তিসঞ্চার হয় নাই। তিনি তখন সেই দুর্বল উপকরণ নিয়ে কাজ করেছিলেন। সেইগুলিকে তিনি খুব বুঝে-সুজে প্রয়োগ করেছিলেন। পথ ও রথ তৈয়ারী করার মত তাঁহাকে কত খাটতে হয়েছিল। সেই জন্ত তাঁহাকে প্রতিভা ক্ষুণ্ণ করতে হয়েছে। সাহিত্যের মধ্যাহ্নগগনে আজ তিনি থাকলে অসাধারণ প্রতিভা দ্বারা সকলকে লজ্জা দিতে পারতেন। কিন্তু সেই প্রভাতগগনে তিনি-যে সাহিত্যের প্রাণ এনেছিলেন। প্রাণশক্তি বড় কম শক্তি নয়; তিনি ভাষাতে সেই শক্তি দিয়ে গিয়েছিলেন। তখন ভাষায় ভাবের কাঠামোও ছিল এক, ধারাও ছিল এক— যেমন নাটক লেখা হলে সব 'বিজয়-বসন্তে'র ছাঁদে··· তিনি সেই ভাষায় সেই ভাবে বৈচিত্র্য এনে দিয়ে গিয়েছিলেন। প্রাণদানের সঙ্গে সঙ্গে সেই বৈচিত্র্য নানা ভাবে ফুটে উঠেছিল। প্রাণ-সঞ্চারের পরেই নানা প্রকার রূপসৃষ্টি— আনন্দরূপ সৃষ্টি হয়। তিনি তখন ভাষার সেই প্রাণে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছিলেন। আমরা যখন শুয়ে থাকি, ঘুমিয়ে পড়ি, তখন সবাই প্রায় এক— জাগলেই বৈচিত্র্যের প্রভেদ হয়। আমাদের ভাষায় প্রাণের নূতন জাগরণে পূর্বের এক রকমের একঘেয়ের আর আবৃত্তি নাই। সকলেই সজাগ হয়ে [ভাষা] প্রয়োগ করতে পাচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্রই এই নূতন প্রাণের জাগরণ দিয়েছেন। প্রাণ ছোট হয়ে আসে, পরে বাড়ে। তখন এই প্রাণের এই জাগরণের আয়তনের— আকার ছোট ছিল, এখন সেই প্রাণবীজ বড় হয়ে উঠেছে। সেই জন্তই তাঁহার প্রতি আজ আমাদের এই নমস্কার-নিবেদন। ভাষায় প্রাণ সকলের চাইতে বড়; জাতির প্রাণ অপেক্ষা ভাষার প্রাণ বেশী বড়; কাজেই সেই প্রাণদানকারীকে আজ আমাদের সকলের নমস্কার।

সংকলন: শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তরটীকা

* বলা আবশ্যক, রবীন্দ্রবীক্ষা-৩'এর তৃতীয় সংকলনে রবীন্দ্রনাথের একটি ভাষণের সবটা না হইলেও বহুলাংশ পাওয়া যায়। ইহার শেষ অনুচ্ছেদটি 'বঙ্কিমচন্দ্র'গ্রন্থেও 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' শিরোনামে উদাহৃত; প্রথম বাক্যটি বর্জিত। উক্ত 'বঙ্কিমপ্রসঙ্গ'-ধৃত ১৫ সংখ্যা সম্পর্কে (পৃ. ১০১-১০৫) এইটুকু তথ্য প্রবাসী পত্রে জানা যায় যে, 'প্রবন্ধটি প্রেসিডেন্সী

কলেজের বঙ্কিম-শরৎ-সমিতির অনুরোধে লেখা', রচনার শেষে তারিখ রহিয়াছে : ২৭শে শ্রাবণ, ১৩৩৮। এ ক্ষেত্রে পত্রিকা-ধৃত শেষ অনুচ্ছেদ মাত্র বর্জিত।

—সম্পাদক, রবীন্দ্রবীক্ষা

১ অধিকাংশ সাময়িক পত্রেই এই বছরের সাহিত্য-সম্মিলন এবং তত্রত্য রবীন্দ্রনাথের ভাষণের উল্লেখ বা সারাংশ প্রকাশিত হয়েছিল। 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র শ্রাবণ ১৩৩০ সংখ্যায় 'সাহিত্য-সম্মিলন ও বঙ্কিমচন্দ্র' নামে প্রবন্ধাকারে প্রসঙ্গটি আলোচিত হয় এবং 'গদ্য কাব্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র একজন শ্রেষ্ঠ কবি, গীতি কাব্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একজন শ্রেষ্ঠ কবি'— বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রে উভয়ের এই তুলনামূলক ধারাবাহী ভূমিকাটি বিশ্লেষণ করা হয়।

২ বঙ্গবিভাগের পর 'জাতীয় ঐক্যবন্ধন রক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়' স্বরূপ পরিষদের তৎকালীন সহকারী সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বর্ষে বর্ষে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন নগরে নগরে সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যবস্থা' করে এই মহৎ উপলক্ষে বিভিন্ন অঞ্চলবাসীদের মধ্যে মিলন-সাধনের আয়োজন করার জন্য পরিষৎকে অনুরোধ করেছিলেন। তদনুসারে বরিশালে বঙ্গের প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনের সময় রবীন্দ্রনাথকেই সভাপতি প্রস্তাব করে প্রথম সাহিত্য-সম্মিলনের আয়োজন হয়, রাজনৈতিক দুর্বিপাকে ঐ সম্মিলন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় পরবৎসর কাশিমবাজারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই সভাপতিত্বে ১৭ই ও ১৮ই কার্তিক ১৩১৪য় প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সূত্রপাত হয়। দ্র. 'পরিষৎ-পরিচয়', কার্তিক ১৩৪৬, পৃ. ১২৩-১২৫

— শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি রবীন্দ্র-গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিসন্ধান

রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির বিশ্লেষণকালে পূর্বে বলা হয়েছে যে, একটি অভিজ্ঞানসংখ্যা অনেক সময়ে একটি গ্রন্থেরই পাণ্ডুলিপি নির্দেশ করে না। তেমনি আবার বলা যায় যে, অনেক সময়ে একটি রবীন্দ্র-গ্রন্থের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি একটি অভিজ্ঞানসংখ্যা-যুক্ত পাণ্ডুলিপিতে বা গুচ্ছেও পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বীথিকা (সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৭৭) কাব্যের আধার-পাণ্ডুলিপির সন্ধান করা যাক।

বীথিকায় সংকলিত কবিতার মোট সংখ্যা নব্বই[১] (৭৮+সংযোজন ১২)। কিন্তু উক্ত নব্বইটি কবিতা-সংবলিত বীথিকা গ্রন্থের কোনো একটি নির্দিষ্ট পাণ্ডুলিপি পাওয়া যাবে না; অর্থাৎ এক-অভিজ্ঞানসংখ্যা-যুক্ত কোনো একটি খাতায় বা গুচ্ছে বীথিকার সকল কবিতার পাণ্ডুলিপি কবিগুরু লিপিবদ্ধ করেন নি বা করান নি। নব্বইটি কবিতার পাণ্ডুলিপি খুঁটিয়ে দেখতে হলে মোট চব্বিশটি (২৪) ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞানসংখ্যা-যুক্ত পাণ্ডুলিপি দেখতে হবে। উক্ত চব্বিশটি পাণ্ডুলিপিতে বীথিকার কবিতার সঙ্গে অন্যান্য রবীন্দ্র-গ্রন্থের রচনাও পাওয়া যাবে।

বীথিকার কবিতা-সংবলিত ২৪টি ভিন্ন ভিন্ন পাণ্ডুলিপির অভিজ্ঞানসংখ্যা পূর্বে গ্রন্থানুসারে পাণ্ডুলিপির তালিকায় মুদ্রিত হয়েছে। এখানে বীথিকার প্রতিটি কবিতার প্রথম পংক্তি, শিরোনাম, কবিতার আধারস্বরূপ পাণ্ডুলিপির ও পাণ্ডুলিপিগুচ্ছের অভিজ্ঞানসংখ্যা উল্লেখ করা গেল। বিন্দুচিহ্নে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তের লেখা ও সংশোধন নির্দেশ করা হয়েছে। 'পাণ্ডুলিপি' বলতে গ্রন্থাকারে যেগুলি বাঁধানো ছিল বা আছে এবং 'গুচ্ছ' (File) বলতে যেগুলি সেরূপ নয়— আলগা পাতার সমষ্টি। আকারে প্রকারে যদি-বা পার্থক্য থাকে, বিষয়বিচারে একত্র সংরক্ষিত। পরবর্তী তালিকায় যে-সকল কবিতার উল্লেখ বিন্দুচিহ্নিত সেগুলির পাণ্ডুলিপির তালিকায় এমন দু-একটি থাকতে পারে যা রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন কি না তার প্রমাণ নেই।

˙অন্ধকারে জানি না কে এল। সত্যরূপ। ১৭০

˙অপরাধ যদি করে থাকো। অপরাধিনী। ১৫, ২৮, ১৭০, গুচ্ছ-৬৬

˙অপরিচিতের দেখা বিকশিত ফুলের উৎসবে। বিহ্বলতা। ১৫, গুচ্ছ-৬৬

˙অবকাশ ঘোরতর অল্প। পত্র। ১৭০, গুচ্ছ-৬৬

˙আকাশ আজিকে নির্মলতম নীল। আশ্বিনে। ১৭৫, গুচ্ছ-৬৬

˙আকাশের দূরত্ব যে, চোখে তারে। প্রলয়। ১৮৫

---

১ বীথিকার রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংস্করণে ১৩৬৭ মাঘে দশটি, ১৩৭৭ বৈশাখে 'পুপুদিদির জন্মদিনে' নামে একটি এবং যন্ত্রস্থ নূতন সংস্করণে 'যুগল পাখি' নামে আরও একটি কবিতা সংযোজিত।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব

রবীন্দ্রবীক্ষা-৩ পৃ. ৩২। ছত্র (নীচে থেকে) ২ বেড়াতোম স্থলে: বেড়াতেম

পৃ. ৫। ছত্র ১৪ চারিত্রপূজা। ১·৬ স্থলে: বিদ্যাসাগরচরিত। ১৭৬

পৃ. ৫৬। ছত্র ৭ Antumn Fostival স্থলে: Autumn Festival

পৃ. ৫৭। ছত্র (নীচে থেকে) ২ পূর্ণিমা ঠাকুর -কৃত স্থলে: পূর্ণিমা ঠাকুর -সংগ্রহ

পৃ. ৫৮। ছত্র ২ রবীন্দ্রনাথের স্থলে: রথীন্দ্রনাথের

শেষ ২ ছত্র রবীন্দ্রবীক্ষা-১ -ভুক্ত হবে

রবীন্দ্রবীক্ষা-৪ পৃ. ৯৭। পাদটীকা ৪ তাঁর / ভারতী স্থলে: তার / ভারতী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঠপঞ্জীকৃত গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ বহু রচনায় বহু ও বিচিত্র পাঠ-পরিবর্তন করেন, রবীন্দ্রসাহিত্যের উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে তা অজানা নয়।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গ্রন্থের নূতন সংস্করণে এরূপ পাঠসংস্কারের আনুপূর্বিক বিবরণ প্রণালীবদ্ধভাবে সংকলন, এ দেশের গ্রন্থপ্রকাশ-ক্ষেত্রে এ কালের এক বিশেষ ঘটনা। রচনা সম্পর্কে আনুষঙ্গিক নানা তথ্যে আর কবির বহু লিপিচিত্রে প্রত্যেক গ্রন্থ বিশেষভাবে অলংকৃত ও সমৃদ্ধ।

সন্ধ্যাসংগীত

এই গ্রন্থমালায় এটি প্রথম গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের কথায়: 'সন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়'। বিভিন্ন সংস্করণের পাঠপরিবর্তনসহ, বিভিন্ন সময়ে এ থেকে বর্জিত কবিতা, সাময়িক পত্রে কবিতাগুলি প্রচারের সূচী, নানা উপলক্ষ্যে সন্ধ্যাসংগীত সম্পর্কে কবির নানা মন্তব্য —এ সবই সংকলিত। মূল্য ৭ টাকা

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

এই গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ। পাঠ-পবিবর্তন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবিতা বা কবিতাংশের বর্জন, নানা উপলক্ষ্যে এই রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মন্তব্য, আর ১২৯১ শ্রাবণের নবজীবন পত্রে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' নামে বিনা স্বাক্ষরে মুদ্রিত কবির বিদ্রূপাত্মক রচনা —এই সংস্করণে সবেরই একত্র সমাহার। তা ছাড়া প্রথম সংস্করণ-ধৃত রাগতালের সূচী ও শব্দার্থ-সংবলিত। মূল্য ৬ টাকা

প্রকৃতির প্রতিশোধ

সম্প্রতি প্রকাশিত, এই গ্রন্থমালার তৃতীয় গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের স্মরণীয় প্রথম দৃশ্যকাব্য। সাতটি সংস্করণের প্রণালীবদ্ধ পাঠপঞ্জীকরণ ছাড়াও, রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি রূপান্তর *Sanyasi or The Ascetic*-এর আদ্যন্ত পাঠের সহিত প্রচলিত বাংলা নাটকের বিস্তারিত তুলনা। প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নানা মন্তব্য (পূর্বপ্রচারিত ও বিশেষভাবে পাণ্ডুলিপি-ধৃত), এ-সবের সমাহার। মূল্য ৮ টাকা

রবীন্দ্রবীক্ষা

অপ্রকাশিত বা বিরলপ্রচারিত রবীন্দ্ররচনা, রবীন্দ্ররচনার পাঠবৈচিত্র্য ও পাঠপরিবর্তন, রবীন্দ্র- জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ প্রণালীবদ্ধ আলোচনা, এসবের ষাণ্মাসিক সংকলন। পূর্বপ্রকাশিত তিনটি সংখ্যার সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচী :—

সংকলন ১ ॥ 'শিল্পী' (তুলনীয় জন্মদিনে / সংখ্যা ২৭) কবিতার পাঠ-বিবর্তন, ঠাকুর-বাড়ির 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক'। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র (প্রচ্ছদ) ও অন্যান্য।

সংকলন ২ ॥ অরূপরতনের অসম্পূর্ণ রূপান্তর ও একটি সম্পূর্ণ প্রেস-কপির সংরক্ষিত অংশ —উভয়ই অ-পূর্ব-প্রচারিত ও নূতন আবিষ্কার বলা চলে— এ সংখ্যায় আনুপূর্বিক মুদ্রিত। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত রেখাবদ্ধ অপরূপ প্রতিকৃতি, রচনাকাল '২৩ চৈত্র ১৩৪৭'। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত প্রচ্ছদ।

সংকলন ৩ ॥ ইংরেজিতে শিশুদের অভিনয়যোগ্য মৌলিক নাটিকা : King and Rebel ও তৎসম্পর্কিত তথ্য। পুনশ্চ-ধৃত 'বালক' কবিতার গদ্যে প্রথম 'খসড়া'। তা ছাড়া 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', রাজা অরূপরতনের গানের তালিকা ও অন্যান্য। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত মুখোষ ও রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লিপিচিত্র বা লেখাঙ্কন।

উক্ত তিন সংখ্যার মূল্য যথাক্রমে দু টাকা। চার টাকা। চার টাকা

প্রাপ্তিস্থান

(১) বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

৬, আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা-১৭

(২) বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা ৭৩

(৩) বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২১০, বিধান সরণি। কলিকাতা ৬

(৪) রবীন্দ্রভবন। শান্তিনিকেতন। বীরভূম

রবীন্দ্রচর্চার ষাণ্মাসিক সংকলন